নির্দেশনায়
আমীরে হেফাজত আল্লামা শাহ আহমদ শফী দা.বা.

বিপ্রতীপ

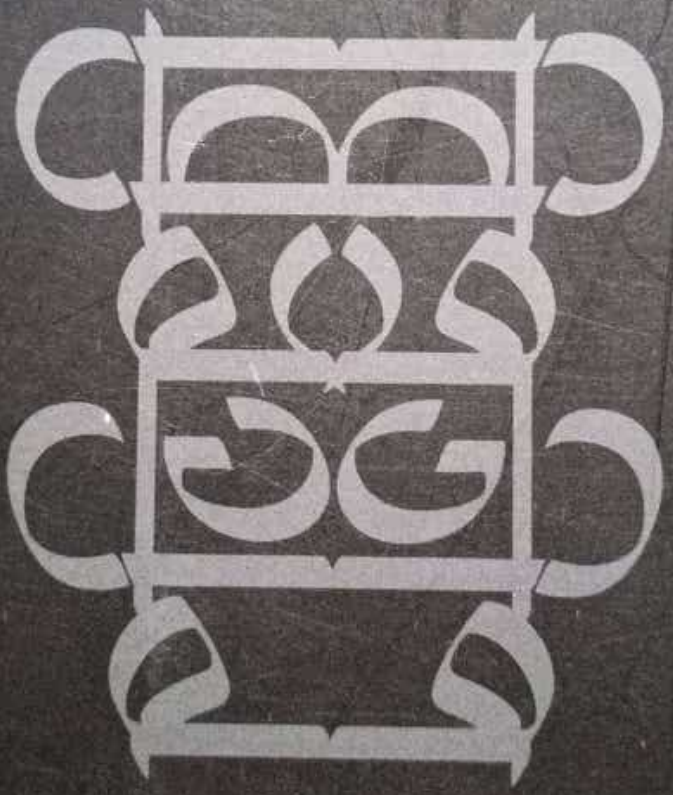

হাসান আনহার

অভিমত

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি মানুষ হিসেবে আমাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আমরা তাঁর শুকরিয়া আদায় করি যে, তিনি আমাদেরকে শেষ নবি হজরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। দুরুদ ও সালাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাগণের ওপর—যাঁরা মানবজাতিকে সঠিক রাস্তা দেখাতে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন, কুরআনুল কারিমের হেফাজতে যাঁরা সব চাইতে অগ্রগামী ছিলেন। আম্মা বা'দ।

কুরআনুল কারিম আল্লাহ তাআলার প্রেরিত একটি অলৌকিক গ্রন্থ। কুরআনুল কারিম এমন একটি অলৌকিক গ্রন্থ যে, যার শব্দ ও অর্থ উভয়ই আল্লাহ তাআলা হেফাজতের জিম্মা নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা অন্যান্য নবিগণের ওপরও একাধিক গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন; কিন্তু কুরআনের মত সেসব গ্রন্থ হেফাজতের জিম্মা নেননি। তাই অতীত থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কেউই কুরআনুল কারিমে কোনো ধরণের বিকৃত সাধন করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না ইনশাআল্লাহ।

ওলামায়ে কেরামগণ সবসময় নিজের শরীরকে ঢাল বানিয়ে কুরআনকে হেফাজত করেছেন। কুরআনের জন্যই নিজের জীবনসহ সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন। যারাই কুরআনকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে, তারাই বিকৃত হয়ে গেছে; ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

কুরআনুল কারিমকে হেফাজতের ধারাবাহিকতা হিসেবে আমার প্রিয় ছাত্র খাইরুল হাসান আনহার রচিত *'বিপ্রতীপ'* গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে আমার ছাত্র খাইরুল হাসান আনহার বর্তমান প্রজন্মের ইসলাম বিদ্বেষী নব্য নাস্তিকদের কুরআনুল কারিমের ওপর বিদ্বেষপূর্ণ আপত্তিগুলোর জবাব দিয়েছে এবং আমার নির্দেশনায় তা গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করছে।

আল্লাহ তাআলা খাইরুল হাসান আনহার এবং বইটিকে কবুল করুন। বইটিকে যে মাকসাদ নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে তা কামিয়াব করুন। ইসলাম এবং কুরআনকে ইসলাম বিদ্বেষীদের বিকৃতি থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

(আল্লামা শাহ আহমদ শফী)
আমীরে হেফাজত ও মহাপরিচালক
হাটহাজারী মাদরাসা, চট্টগ্রাম
৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

অর্পণ

আমীরে হেফাজত আল্লামা শাহ আহমদ শফী
দা.বা.-কে

দুই হাজার তেরো সালে যিনি আমাদের জন্য একটি
আলোকিত ভোর এনেছিলেন।

এবং সেই আলোকিত ভোরের জন্য যারা রক্তসুরমায়
অবগাহন করেছিলেন, প্রভাতের সূর্য যাদের রক্তে
রক্তিম হয়ে উঠেছিল, সেসব শহিদ ও বীরদের
উদ্দেশ্যে।

আলাপনগল্প

শীতের সকাল। চারদিক কুয়াশার চাদরে আবৃত। এই শীত ও কুয়াশার মধ্যেই আমি আর আমার ছোটভাই আব্বাজানের হাত ধরে সিলেট রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। চট্টগ্রাম থেকে সিলেটের উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি। একসময় আমাদের অপেক্ষার প্রহর শেষ হল এবং চট্টগ্রাম থেকে আগত ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মে এসে থামলো। আব্বাজান আমাদেরকে নির্দিষ্ট একটি বগির সামনে নিয়ে গেলেন। বগির সামনে যেতেই দেখা গেলো একজন বৃদ্ধ ও একজন যুবক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে আমাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছেন। বৃদ্ধ লোকটিই ছিলেন আমার শায়খ শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী দা.বা.।

শায়খের সাথে ওটাই ছিল আমার সর্বপ্রথম সরাসরি সাক্ষাৎ।

আমি তখন সাত বা আট বছরের বালক ছিলাম। আর তখন থেকেই আমাদের বাসায় শায়খের আগমন শুরু। এরপর থেকে সিলেটে গেলেই শায়খ আমাদের বাসায়ই থাকতেন।

দুই হাজার তেরো সালে আমি চট্টগ্রামে শায়খের কাছে চলে আসি এবং এখন পর্যন্ত তাঁর সাহচর্যে আছি। তাঁকে দেখে শিখি। তিনি যেখানে পা ফেলেন ঠিক তার পিছনেই পা ফেলার চেষ্টা করি।

আল্লাহ তাআলা আমার শায়খের হায়াতকে আরও দীর্ঘায়ত করুন। আমিন।

গত বছরের শেষদিকের সময়ের কথা। ওই সময়টাতে আমি ব্যস্ত ছিলাম খুব। এরমাঝেই একদিন তালিমুদ্দিন ফাউন্ডেশনের আমির আব্দুস সবুর খান সমুন ভাই নাস্তিক আসিফ মহিউদ্দিনের ওয়েবসাইট থেকে কুরআনের ওপর আপত্তিমূলক একটি লেখার লিংক পাঠিয়ে বলেছিলেন—'নাস্তিকরা স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির ছেলে-মেয়েদের এ ধরনের লেখা দেখিয়ে ধোকা দিচ্ছে। এই আপত্তিগুলোর জবাব জানা আছে কি না।'

সুমন ভাইয়ের কথাটি আমার হৃদয়ে দাগ কাটে। আমি সুমন ভাইকে বলছিলাম, জানা আছে; তবে এখন এতে হাত দিতে পারব না ব্যস্ততার কারণে। পরে দেখব।

সুমন ভাইকে বলা আমার সেই 'পরে দেখা'টি প্রায় একবছর পর বাস্তবায়িত হয়েছিল। কেননা, ওই সময়টাতেই আমার শায়খ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শায়খকে নিয়ে আমরা চট্টগ্রাম, ঢাকা, দিল্লি হাসপাতালে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আর শায়খও প্রায় ছয়-সাত মাস পর মোটামুটি সুস্থ হোন। শায়খ সুস্থ হওয়ার কয়েকদিন পর সুমন ভাইয়ের পাঠানো সেই লিংকের কথা স্মরণ হলে একদিন তা শায়খকে পড়ে শোনালাম। তখন

শায়খ আমাকে নির্দেশ দিলেন, কুরআনের ওপর আপত্তিমূলক এরকম লেখাগুলোর জবাব লিখে বই আকারে প্রকাশ করতে। আল্লাহ তাআলা ওপর ভরসা করে শায়খের দুআ নিয়ে জবাবগুলো লিখলাম। যা অবশেষে 'বিপ্রতীপ' নামে বই আকারে আপনাদের সামনে আছে।

উক্ত বইয়ে তাদের (নাস্তিকদের) যে আপত্তিগুলো আছে তা তারা মিথ্যাচার এবং স্ববিরোধী হিসেবে করেছে। আর বাকী আপত্তিগুলো তাদের মূর্খতা। অল্প জ্ঞান নিয়েই আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলে মূর্খতামূলক প্রশ্ন করে ভেবেছে যে, তারা বিরাট কাজ করে ফেলেছে! হাজার হাজার বছর ধরে যেখানে কেউই কুরআনকে ভুল সাব্যস্ত করতে পারেনি, সে কাজ তারাই করে ফেলছে!

আরও অবাক করা কথা হলো, এই নাস্তিকগুলো চতুরতাস্বরূপ একই প্রসঙ্গের আয়াতগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় আদালাভাবে এনে ঘুরেফিরে একই আপত্তি তুলেছে। কিন্তু আমি সেসব আয়াতকে প্রসঙ্গভিত্তিক একত্রে এনে সেই আলোকে তার ব্যাখ্যা তুলে ধরেছি এবং যেসব আপত্তিতে তারা আমাদের বইগুলো থেকে প্রমাণ দিয়েছে, আমি সংক্ষেপে তার সূত্র পর্যালোচনাও তুলে ধরেছি।

এটি আমার প্রথম বই। নতুন হিসেবে ভুলত্রুটি থাকবেই; স্বাভাবিক। এরকম কিছু দৃষ্টিগোচর হলে ধরিয়ে দিবেন, আমি মেনে নেব এবং আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

এই বইটির জন্য আমি আমার শায়খ আল্লামা শাহ আহমদ শফী দা.বা. ও আমার মা-বাবার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে চাই না। কেননা, আমার ওপর তাঁদের ঋণ এতই বেশি যে, কৃতজ্ঞতা দ্বারা তা আদায় করা সম্ভব নয়! তবে আপনাদের কাছে আমার করজোড়ে অনুরোধ, আমার শায়খ এবং মা-বাবার জন্য দোয়া করবেন। সাথে আমি গুনাহগারের জন্য। আল্লাহ তাআলা এই দুআর বদলা আপনাদেরকে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

এই বইটির জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি শায়খের সাহেবজাদা ও হাটহাজারী মাদরাসার সম্মানিত উসতাদ মাওলানা আনাস মাদানি দা.বা., শায়খের সেক্রেটারি মাওলানা শফিউল আলম দা.বা., আবদুস সবুর খান সুমন, কালান্তরের প্রকাশক ও আমার মামা মাওলানা সালমান বিন মালিক এবং আবুল কালাম আজাদ, নেসার উদ্দীন রম্মান, উম্মে তাহিয়া এবং আমার দুই বোন মাজিদা রিফা ও সাজিদা রিজার। আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম প্রতিদান দিন। আমিন।

খাইরুল হাসান আনহার
হাটহাজারী মাদরাসা, চট্টগ্রাম
০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

প্রকাশকের কিছু কথা

আল কুরআন। আল্লাহ তাআলার কালাম। মহাপবিত্র ঐশী গ্রন্থ। সন্দেহ-সংশয়ের সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে যার অবস্থান। এর উৎপত্তিস্থল খোদ মহান স্রষ্টা। যার ওপর নির্ভর করে ইসলামের ভিত্তি।

এ নির্ভুল গ্রন্থ কুরআনুল কারিমকে নিয়েও খোদাদ্রোহী সেকুলারদের অসাড় আপত্তির অন্ত নেই। আসলে আপত্তি তো নয়; সরলমনা মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার একধরনের অপপ্রয়াস মাত্র। বিভিন্ন ধরনের দলিলকে বিকৃত করে তারা তাদের মিশন চালিয়ে যাচ্ছে এবং এভাবে ক্রমশ এজেন্ডা বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে।

আলিমকুল শিরোমণি আল্লামা শাহ আহমদ শফি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় রচিত হয়েছে নাস্তিকদের কুরআন সংক্রান্ত আপত্তিগুলোর অসাধারণ দালিলিক পর্যালোচনামূলক গ্রন্থ 'বিপ্রতীপ'।

গ্রন্থটি রচনা করেছেন শাইখের একান্ত সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তরুণ আলিম হাসান আনহার। সম্পাদনা করেছেন তরুণ লেখক, সম্পাদক ও অনুবাদক মাওলানা মুফতি আলী হাসান উসামা।

আমরা আশাবাদী, বইটি সাধারণ পাঠক এবং আলেম উলামার জন্য খুবই উপকারী হবে। বিশেষ করে তরুণদের জন্য চিন্তার খোরাক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বইটি যথাসম্ভব নির্ভুল রাখতে আমরা চেষ্টা করেছি। তারপরও তথ্য, ভাষা, বানান বা কোনো ধরনের ত্রুটি ধরা পড়লে অনুগ্রহ করে আমাদের অবগতি করবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে আমরা শোধরে নেব এবং আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

বইটির লেখক, সম্পাদক এবং সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ সবাইকে উত্তম বদলা দিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দুআ করি, তিনি যেন বইটিকে কবুল করেন এবং পরকালে আমাদের জন্য নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দেন।

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
০১ এপ্রিল ২০১৮

সূচি

কোরান কি অবিকৃত # ১১
কোরানের যত কন্ট্রাডিকশন # ৩৯
মানবিক গ্রন্থ কোরান # ৭১
সংশয়বাদ # ৯১

কোরান কি অবিকৃত

'কুরআনুল কারিম একটি অবিকৃত গ্রন্থ। আল্লাহ তাআলা নিজেই কুরআনকে হেফাজত করার ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনকে অবতীর্ণ করার পূর্বেও অনেক গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছিলেন, কিন্তু কোনো গ্রন্থকে হেফাজত করার ওয়াদা করেননি; বরং একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সব গ্রন্থই বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তাওরাত এবং ইঞ্জিল শরিফের মূল কপি তো বর্তমানে একদম বিলুপ্ত। কিন্তু কুরআনুল কারিম চৌদ্দ শ বছর পূর্বে যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল, আজও সেই একই আকৃতিতে আছে। তাতে কোন ধরণের বিকৃতি হয়নি।

'আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তাঁর হেফাজত করব।'[১]

---

[১] সুরা হিজর : ৯। *আল-খাইরুল কাসির* : ৮ নম্বর পৃষ্ঠা।

কোরান কি অবিকৃত[২]

শাহিনুর রহমান শাহিন

'আমাদের দেশের অনেক মানুষ, বলা যেতে পারে অধিকাংশ মানুষ কোরানভিত্তিক শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাচ্ছে। এর জন্য তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিতান্ত নিরীহ বাঙালি থেকে চরম নৃশংস মানুষে বদলে যেতে প্রস্তুত রয়েছে।

যাইহোক, এই চাওয়ার স্বপক্ষে প্রথমেই তারা যে কথাটি বলে থাকে, সেটা হলো অনেকটা এ রকম :

'কোরানের একটি অক্ষরও বিকৃত হয়নি। নবি মুহাম্মদের কাছে আল্লাহ অহি পাঠিয়েছেন এবং সম্পূর্ণ অহিটুকু ছোট-বড়-মাঝারি কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই বর্তমান কোরান আকারে সংকলিত হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা কোরানের অলৌকিকতার প্রমাণ, যা অন্য কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি।'

সম্পূর্ণ ভুল একটি কথা। কোরান মোটেও যথাযথভাবে সংকলিত হয়নি। বর্তমানের মতো অতীতেও অনেকে এর সমালোচনা করেছেন। প্রচলিত ইসলামি সূত্রগুলো পর্যালোচনা করে আমরাও সহজে মোল্লাদের দাবির অসারতা প্রমাণ করতে পারি। এই পোস্টে আমি কোরান বিকৃতির স্বপক্ষে কিছু রেফারেন্স দিচ্ছি। আশা করছি, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বুঝতে পারবেন যে, কোরান এমন কোনো গ্রন্থ নয়, যার কিছু অংশ মুখস্থ না থাকলে মানুষকে জবাই করে ফেলা প্রয়োজন।'

---

[২] https://www.nastikya.com/archives/295.

এক :

বর্তমানে প্রচলিত কোরান সংকলনের কৃতিত্ব দেওয়া হয় তৃতীয় খলিফা উসমানকে। সকলেই জানেন, খলিফা উসমানকে বিদ্রোহী মুসলমানগণ হত্যা করেছিল। হত্যা করার সময় তাকে কোরান বিকৃতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। মৃত্যুর প্রাক্কালে তাকে এভাবে অভিযুক্ত করেছিলেন খলিফা আবু বকরের পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর। এই মুহাম্মদ ছিলেন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, যিনি মিসরের শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া আরও অনেকে এই ব্যাপারে খলিফা উসমানের সমালোচনা করেছেন। আমরা ধীরে ধীরে এসব জানতে পারব।' *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৭ম খণ্ড, ৩৩২-৩৩ পৃষ্ঠা।*

উত্তর :

শাহিনুর রহমান শাহিন। তিনি কুরআনুল কারিমকে বিকৃত গ্রন্থ হিসেবে সাব্যস্ত করতে লম্বাচওড়া আলোচনা করেছেন। তিনি তার কথার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আসার কোশেশও করেছেন। কিন্তু আফসোসের কথা হলো, তিনি প্রমাণগুলো নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ইচ্ছেমতো মিথ্যাচার করেছেন। আবার ভিত্তিহীন ও অপ্রাসঙ্গিক সূত্রসমূহ উল্লেখ করে নিজের কথার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ দেখানোরও চেষ্টা করেছেন। আমি প্রথমে তার আপত্তির জবাব দিয়ে পরে তার বর্ণিত সূত্রের প্রতি হালকা দৃষ্টিপাত করব।

তার কথা হলো, হজরত *'উসমানকে বিদ্রোহী মুসলমানগণ হত্যা করেছিল। হত্যা করার সময় তাকে কোরান বিকৃতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। মৃত্যুর প্রাক্কালে তাকে এভাবে অভিযুক্ত করেছিলেন খলিফা আবু বকরের পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর।'*

একদম ভিত্তিহীন একটি কথা। নাস্তিকদের চিরাচরিত অভ্যাসানুসারে তিনি এখানে সত্যকে গোপন করে চরম মিথ্যাচার করেছেন। প্রথমত : হজরত উসমান রা.-কে যে ব্যক্তি শহিদ (হত্যা) করেছিল, তার নাম নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন, তার নাম ছিল রোমান। কেউ বলেন, তার নাম ছিল সুদান ইবনে রোমান আল মুরাদি। আবার কেউ কেউ বলেন, তার নাম ছিল আসওয়াদ ইবনে হুমরান। তবে সে ব্যক্তি যেই হোক না কেন, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ছিলেন না। কারণ, যখন হজরত উসমান রা.-কে শহিদ করা হয়, তখন মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর হজরত উসমানের ঘরেই উপস্থিত ছিলেন না। বরং

তিনি ছিলেন ঘরের বাইরে। শাহাদাতের ঘটনা ঘটার পূর্বে তিনি ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, এটা ঠিক। কিন্তু ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় তিনি অবস্থান করছিলেন ঘরের বাইরে। হজরত উসমান রা. শহিদ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় তিনি হজরত উসমানের ঘরে প্রবেশ করেন। আর এ কথাটি স্পষ্টভাবেই *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* গ্রন্থে উল্লেখ আছে। সাথে এটাও উল্লেখ আছে যে, ঐতিহাসিক যে সূত্রে হজরত উসমান রা.-এর হত্যাকারী হিসেবে মুহাম্মাদ বিন আবু বকরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সে সূত্র নিতান্ত দুর্বল ও অপ্রমাণিত।[৩]

ইমাম নববি রহ. বলেন, 'তাঁর হত্যাকাণ্ডে সাহাবিদের মধ্য থেকে কেউ অংশগ্রহণ করেনি।'[৪] একই কথা বলেছেন ইমাম ইবনু কাসির রহ.-সহ আরও অনেক বিদগ্ধ ইমাম।[৫]

দ্বিতীয়ত : তার আরেকটি কথা হলো— *'হত্যা করার সময় তাকে (হজরত উসমান রা.কে) কোরান বিকৃতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।'* এই কথাটি পড়ে যে কেউ মনে করতে পারেন, হজরত উসমান রা.-কে বিদ্রোহী সন্ত্রাসীরা কুরআন বিকৃতির দায়েই হত্যা করেছিল! কিন্তু বাস্তবতা হলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মূলত হজরত উসমান রা. খুব নরম প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর মধ্যে কঠোরতা ছিল না। তাঁর শাসনকালের প্রথম ছয় বছর শান্তিপূর্ণভাবে এবং স্বাভাবিকভাবে অতিবাহিত হয়। কিন্তু এর পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর মনে করে এমন কিছু পদক্ষেপ নিলেন, যা সবাই মেনে নিতে পারেনি। এর ভিত্তিতে জনসাধারণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। কিন্তু হজরত উসমান রা. নরম প্রকৃতির মানুষ হওয়ায় কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা নেননি। আর এই সুযোগটিকেই কাজে লাগায় ইহুদিপুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা। সে মিশরের অধিবাসীদের হজরত উসমানের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ৩৫ হিজরিতে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার নেতৃত্বে মিশর থেকে ছদ্মবেশে ছয় শজন লোক উমরাহ আদায়ের বাহানায় মদিনায় আসে। তখন হজরত আলি রা. তাদের কাছে যান এবং তাদের অভিযোগ কী—তা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। তারা আলি রা.-এর কাছে হজরত উসমানের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপন করলে তিনি তা খণ্ডন করে দেন।

---

[৩] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*: খণ্ড নম্বর ০৭, পৃষ্ঠা নম্বর ১৬৬-১৬৭। প্রকাশনা: দারুল আকিদাহ, ইস্কান্দারিয়া, কায়রো, মিসর।
[৪] *শরহু মুসলিম*: ১৫/১৪৮।
[৫] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৭/২২১।

তাদের অভিযোগ এবং হজরত আলির খণ্ডন ছিল নিম্নরূপ :

তাদের অভিযোগ :

> 'হজরত উসমান রা. সরকারি চারণভূমি নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেছেন।'

আলি রা.-এর খণ্ডন :

> 'হজরত উসমান সরকারি চারণভূমি নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেননি। বরং তার সময়ে সরকারি উট চরাবার জন্য সরকারি চারণভূমির সীমানা নির্ধারণ করে তা আলাদা করে দেওয়া হয়, যাতে উটগুলো মোটাতাজা এবং হৃষ্টপুষ্ট হতে পারে। হজরত উসমান তাঁর নিজের ভেড়া-বকরি চরাবার জন্য সেই চারণভূমির সীমানা পৃথক করেননি।'

তাদের অভিযোগ :

> 'হজরত উসমান রা. কুরআন শরিফের কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলেছেন।'

আলি রা.-এর খণ্ডন :

> 'হজরত উসমান কুরআন শরিফের সবগুলো কপি পোড়াননি; বরং কেরাতের পদ্ধতিগত ভিন্নতাসংবলিত কয়েকটি কপি সাহাবিগণের সম্মতিক্রমে পোড়ানো হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য কপিকে পূর্বের হালেই বহাল রাখা হয়।'

এভাবে তারা হজরত উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযোগ করে এবং হজরত আলি রা. তাদের অভিযোগগুলো খণ্ডন করলে তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে মিশরে ফিরে যায়। কিন্তু ইহুদিপুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার প্ররোচনায় তারা আবার ফিরে আসে এবং হজরত উসমান রা.-কে দীর্ঘদিন গৃহবন্দি করে রেখে একপর্যায়ে তাঁকে শহিদ করে দেয়।[৬]

এখানে প্রথমত একটি বিষয় কিন্তু লক্ষণীয় যে, তাদের অভিযোগে কুরআন বিকৃতির কথা ছিল না; কুরআন পোড়ানোর কথা ছিল। তথাপি হজরত আলি রা.-এর উত্তর শুনে তারা তাদের অভিযোগও প্রত্যাহার করে নেয়। তো এ ঘটনায় শাহিনুর রহমান শাহিন কুরআন বিকৃতির অভিযোগ কোথায় পেলেন?

---

[৬] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* : খণ্ড নম্বর ০৭, পৃষ্ঠা নম্বর ১৫৪। *তারিখে তাবারি* : খণ্ড নম্বর ৫, পৃষ্ঠা নম্বর ৯৮-৯৯। *তারিখে ইসলাম* : খণ্ড নম্বর ১, পৃষ্ঠা নম্বর ৩৯৬ থেকে ৪১৪। প্রকাশনা : ফায়সাল পাবলিকেশন্স, দেওবন্দ।

দ্বিতীয়ত : বিদ্রোহী সন্ত্রাসীরা যখন হজরত উসমান রা.-কে গৃহবন্দি করে রাখে, তখন মদিনার শীর্ষ সাহাবিগণ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করার জন্য হজরত উসমানের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন; কিন্তু হজরত উসমান রা. তাঁদের অনুমতি দেননি এই ভেবে যে, 'তাঁর একার জন্য অনেকগুলো মানুষ যুদ্ধে মারা যাবে।' শেষ পর্যন্ত হজরত আলি রা. তাঁর দুই ছেলে হজরত হাসান এবং হুসাইন রা.-কে উসমান রা.-এর ঘর পাহারা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। সে সময়ে হজরত হাসান ও হুসাইনের সাথে অন্যান্য সাহাবিগণের সন্তানরাও যোগ দেন। যদি হজরত উসমান রা. নিজে একাই—অর্থাৎ সাহাবিগণের সম্মতি ছাড়াই—কুরআনের পদ্ধতিগত ভিন্নতাসংবলিত কপিগুলো পোড়াতেন, তাহলে হজরত আলিসহ অন্যান্য সাহাবিগণ কখনোই হজরত উসমান রা.-এর পক্ষ নিয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন না।[৭]

সূত্র পর্যালোচনা :
মূল পয়েন্টেই বলেছি যে, তিনি যা বলেছেন এবং আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে যা উল্লেখিত, তা সম্পূর্ণ উল্টো।

দুই :

'কোরানের আয়াত-শব্দ-অক্ষর সংখ্যার কোন স্থিরতা নেই। প্রাচীন ও আধুনিক, সকল তথ্যসূত্রে এসব সংখ্যা নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক হয়েছে। এমনকি বর্তমানেও প্রচলিত কোরানের আয়াত সংখ্যা নিয়ে একেকজন একেক কথা বলছেন। বিভিন্ন জনের মতামত অনুযায়ী এই সংখ্যাটি ৬০০০/ ৬২০৪/ ৬২১৪/ ৬২১৯/ ৬২২৫/ ৬২২৬/ ৬২৩৬/ ৬২১৬/ ৬২৫০/ ৬২১২/ ৬২১৮/ ৬৬৬৬/ ৬২২১/ ৬৩৪৮ ইত্যাদির মধ্যে যেকোনো একটি হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। আয়াতের পাশাপাশি অক্ষর ও শব্দের সংখ্যা নিয়েও প্রচুর মতানৈক্য রয়েছে। *তাফসিরে ইবনে কাসির : ১ম খণ্ড, ৫০-৫১ পৃষ্ঠা। সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ : ১ম খণ্ড, ৭০ পৃষ্ঠা। তাফসিরে জালালাইন : ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা। কোরান হাদিস সংকলনের ইতিহাস : ৬৯ পৃষ্ঠা। উইকিপিডিয়া।'*

আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : পৃষ্ঠা নম্বর ১৫৯ খণ্ড নম্বর ০৭, প্রকাশনা: দারুল আকিদাহ, ইস্কান্দারিয়া, কায়রো, মিসর।

উত্তর :

কুরআনের আয়াত সংখ্যা কেরাতশাস্ত্রের স্বতন্ত্র একটি শাখা। এই শাস্ত্র চর্চার জন্য মক্কা-মদিনা, ইরাক ও সিরিয়ায় স্বতন্ত্র শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। আর সেসব শিক্ষাকেন্দ্রে আয়াত সংখ্যা নিয়ে গবেষণাও হতো। যেহেতু প্রতিটা গবেষণাকেন্দ্র নিজ নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী আয়াত সংখ্যা নিয়ে গবেষণা করেছে, তাই পদ্ধতিগত ভিন্নতার কারণে সেসব শিক্ষাকেন্দ্রের গবেষণার ফলাফলেও আয়াতের সংখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। যেমন : আমরা জানি সুরা ইখলাসে রয়েছে চারটি আয়াত, যথাক্রমে :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ * اللّٰهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

এটা হলো মদিনা এবং ইরাকের গবেষণাকেন্দ্রর ফলাফল অনুযায়ী।

কিন্তু মক্কা ও সিরিয়ার গবেষণাকেন্দ্রের ফলাফল অনুযায়ী সুরা ইখলাসে মোট পাঁচটি আয়াত, যথাক্রমে :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ * اللّٰهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

মদিনা এবং ইরাকের গবেষকগণ 'লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ'কে এক আয়াত ধরেছেন। আবার অন্যদিকে মক্কা ও সিরিয়ার গবেষকগণ 'লাম ইয়ালিদ'কে এক আয়াত এবং 'ওয়া লাম ইউলাদ'কে আরেক আয়াত হিসেবে ধরেছেন। লক্ষ করে দেখুন—আয়াত একই আছে, তবে শুধু সংখ্যা গণনায় পার্থক্য হয়ে গেছে গবেষণার পদ্ধতি ভিন্ন হওয়ার কারণে। স্মতর্ব্য যে, এই আয়াতসংখ্যা গণনার এসব পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে কুরআনুল কারিমের আয়াত কমেও যায়নি, আবার বাড়েওনি; বরং আয়াত আগে যেমন ছিল, তেমনই আছে। কোনো শব্দ বা অক্ষরের কম-বেশও হয়নি। আর এটা শুধু কুরআনের আয়াতের ক্ষেত্রে নয়; বরং যেকোনো জিনিস নিয়ে যদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা করে, তাহলে তাদের ফলাফলে পার্থক্য থাকবেই। এক গবেষণা কেন্দ্রের ফলাফল অন্যটির হুবহু হবে না।

তাই পদ্ধতিগত পার্থক্যের জন্য যে মানুষ বলে কুরআন বিকৃত গ্রন্থ, সে চরম মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়।[৮]

---

[৮] *আল-ইযাহ ফিল কিরাআহ* : ১৫ নম্বর অধ্যায়। *ফুনুনুল আফনান ফি উয়ুনি উলূমিল কুরআন* : পৃষ্ঠা নম্বর ২৩৮ ও ২৪৯, প্রকাশনা: দারুল বাশাইয়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত, লেবানন।

সূত্র পর্যালোচনা :

"ক) *তাফসিরে ইবনে কাসির*: ১ম খণ্ড, ৫০-৫১ পৃষ্ঠা।"

- ইবনে কাসিরের উক্ত পৃষ্ঠাগুলোতে কোন সুরা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে, তা-সহ আয়াত গণনা পদ্ধতির পার্থক্যটি উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ বিষয়ে আমরা ওপরে আলোচনা করেছি।

"খ) *সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ*: ১ম খণ্ড, ৭০ পৃষ্ঠা।"

- উক্ত পৃষ্ঠায় আয়াতের সংখ্যা সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।

একটি তথ্য জেনে রাখা দরকার যে, 'ইসলামী বিশ্বকোষ' ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তৈরি করা হয়নি, বরং এটি মূলত লাইডেনের 'শর্টার এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলাম' এর অনুবাদ। তবে হুবহু অনুবাদ নয়। প্রথমে বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে এর অনুবাদ হয়। কিন্তু বাংলা একাডেমি পরে তা আর না ছাপিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কাছে হস্তান্তর করে। ফাউন্ডেশন তাতে কিছু সংযোজন ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করে।

"গ) *তাফসিরে জালালাইন*: ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।"

-উক্ত পৃষ্ঠায় একটি নকশা দেওয়া আছে। সে নকশায় আয়াত সংখ্যা গবেষণাকেন্দ্রগুলোর ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে।

"ঘ) *কোরান হাদিস সংকলনের ইতিহাস*: ৬৯ পৃষ্ঠা।"

- *কুরআন হাদিস সংকলনের ইতিহাসের* উক্ত পৃষ্ঠায় সুরা সংখ্যা, আয়াত সংখ্যা, শব্দ সংখ্যা, আলিফ, বা, তা, ছা ইত্যাদির সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

তিন :

'অনেকেই বলে থাকেন, নবি মুহাম্মদের ওপর অবতীর্ণ হওয়া কোরানের বেশিরভাগই হারিয়ে গেছে। সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উমর ছিলেন দ্বিতীয় খলিফা উমরের পুত্র। নবি মুহাম্মদ তাকেও সৎ লোক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনিও ১৬৩০টি নির্ভরযোগ্য হাদিস বর্ণনা করেছেন, বর্ণনাকারীদের মধ্যে যা চতুর্থ সর্বোচ্চ। আয়াত বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি মন্তব্য করেছেন :

'কোরান সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে, এই কথাটি কারও বলা উচিত নয়। সে কীভাবে জানবে যে, পরিপূর্ণ জ্ঞান কী ছিল! কোরানের খুব বড় একটা অংশ এখন তার কাছে অপ্রচলিত। এর পরিবর্তে সে বলতে পারে, আমি কোরানের সেটুকুই পেয়েছি, যা এখন উপস্থিত রয়েছে।'

এই কথার স্বপক্ষে নবিপত্নী আয়িশা বলেছেন, খলিফা উসমান তার কোরানে সুরা আহজাবের সমগ্র অংশটুকু রাখেননি, যা ছিল দুই শতাধিক আয়াত দ্বারা সমৃদ্ধ। এ ছাড়া খলিফা উমর, সাহাবি আনাস বিন মালিক, উবাই বিন কাব, আবু ইউনুস, আবু ওয়াকিদ আল-লাইহি, মাসলামা বিন মাখলাদ আল-আনসারি প্রমুখ পৃথক পৃথক আয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা তারা পাঠ করতেন। এগুলো বর্তমানে প্রচলিত কোরানে উল্লেখ করা হয়নি।

সাহাবি আনাস বিন মালিক ছিলেন নবি মুহাম্মদের খাদেম। তিনি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২২৩৬টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

উবাই বিন কাব একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবি। বুখারি-মুসলিমের অনেক হাদিসে বলা হয়েছে, যে চারজন সাহাবি নিজের উদ্যোগে কোরান সংকলন করেছিলেন, তিনি তাদের মধ্যে একজন।

আর নবি মুহাম্মদ যে চারজনের কাছে কোরান শিক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি তাদেরও একজন। এমনও হাদিস আছে, স্বয়ং আল্লাহ উবাই বিন কাবের নাম উল্লেখ করে তাকে কোরান আবৃত্তি করতে বলেছেন।

অথচ ওপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আনাস বিন মালিক ও উবাই বিন কাবের মতো সাহাবি উসমানের কোরানের বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

আল-ইতকান : ২য় খণ্ড ১১-১৫ পৃষ্ঠা। কোরআন হাদিস সংকলনের ইতিহাস : ৮১ পৃষ্ঠা; সহিহ মুসলিম : ৬১৪৫ নম্বর হাদিস। সহিহ বুখারি : ৩৪৮৮, ৩৫৩৬-৩৭, ৪৫৯৫-৯৬ ও ৪৬৩৭ নম্বর হাদিস। সহিহ মুসলিম : ৬১৪৮-৪৯ নম্বর হাদিস।'

উত্তর :

প্রথমে এখানে একটি কথা ভালো করে বুঝতে হবে যে, হজরত উসমান রা. নতুন করে কুরআন সংকলন করেননি; বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংকলিত কুরআনকে একটি লিখনশৈলীতে কয়েকটি পাণ্ডুলিপি অনুলিপি করিয়েছেন। মূলত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যখন কুরআন অবতীর্ণ হতো, তখন প্রথমদিকে তিনি হজরত জিবরিল আ.-এর মুখেমুখে পড়ে তা মুখস্থ করতেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, আপনি এভাবে মুখেমুখে না পড়লেও কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, তা এমনিতেই আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে। এরপর থেকে যখনই কোনো আয়াত অবতীর্ণ হতো, তা সাথে সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখস্থ হয়ে যেত। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিগণকে ডেকে অর্থ ও মর্মসহ তা ভালোভাবে শিখিয়ে দিতেন। পাশাপাশি অহি লেখক সাহাবিগণের কাউকে ডেকে সে আয়াত লিখিয়েও নিতেন। সাহাবিগণ নামাজে নিজের মুখস্থ কুরআনকে দোহরাতেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও প্রতি রামাজান মাসে হজরত জিবরিল আ.-এর সাথে পূর্ণ কুরআন পুনরাবৃত্তি করতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কুরআনের হাফিজ অগণিত ছিলেন। সাহাবিগণ কুরআন শিক্ষার বেলায় একজন অন্যজন থেকে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করতেন।

এমনও হয়েছে যে, কোনো নারী তাঁর বিবাহের মহর হিসেবে স্বামীর কাছে কোনো ধরনের সম্পদ না চেয়ে বলে বসেছেন যে, স্বামী মহর হিসেবে তাকে কুরআন শেখালেই হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এভাবেই ব্যাপক আকারে কুরআনের চর্চা হতো। কিন্তু তখনও কুরআনকে একটি পাণ্ডুলিপিতে একত্র করা হয়নি। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জায়গায় সংরক্ষিত ছিল।[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং সে যুদ্ধে কুরআনের অনেক হাফিজ শহিদ হন। তখন হজরত উমর হজরত আবু বকর রা.-কে পরামর্শ দেন কুরআনকে একটি পাণ্ডুলিপিতে একত্র করার। হজরত আবু বকর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাতিবে ওয়াহি (কুরআন লেখক) হজরত যায়দ বিন সাবিত রা.-কে ডেকে কুরআনকে একটি পাণ্ডুলিপিতে একত্র করার নির্দেশ দেন। এই কাজে হজরত যায়দ বিন সাবিতের সাথে হজরত উমর রা.ও যোগ দেন।

হজরত যায়দ বিন সাবিত কুরআনের বিক্ষিপ্ত থাকা আয়াতগুলোকে খুঁজে খুঁজে একত্র করেন। তিনি প্রতিটি আয়াতকে গ্রহণ করার সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করেন।

প্রথমে তিনি নিজের মুখস্থে থাকা আয়াতের সাথে লিখিত আয়াতকে মিলিয়ে দেখতেন এবং এরপর হজরত উমর রা.ও তাঁর মুখস্থে থাকা আয়াতের সাথে লিখিত আয়াতকে মিলিয়ে দেখতেন। অতঃপর সে আয়াত আরও দুজন সাহাবির মুখস্থ আছে কি না—তাও দেখতেন। যে আয়াতের ব্যাপারে দুজন সাহাবি এই বলে সাক্ষ্য না দিতেন যে, এই আয়াত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে লিপিবদ্ধ হয়নি, সে আয়াত তাঁরা গ্রহণ করতেন না। এরপর সে আয়াতকে অন্যান্য সাহাবিগণের লিখিত আয়াতের সাথেও মিলিয়ে দেখতেন।

আর এভাবেই অনেক সতর্কতার সাথে কুরআনুল কারিমকে একত্র করা হয়। কুরআনকে একত্র করার পর হজরত আবু বকর রা. কপিটি নিজের কাছে রেখে দেন।

---

[১] *আল-ইতকান*: পৃষ্ঠা নম্বর ১৮৬ খণ্ড নম্বর ১, প্রকাশনা: দারুল হাদিস, কায়রো, মিসর। *আত-তিবয়ান ফি উলুমিল কুরআন*: ড. মুহাম্মাদ আলি আস-সাবুনি, চতুর্থ অধ্যায়, *উলুমুল কুরআন*, জাস্টিস তাকি উসমানি, পৃষ্ঠা নম্বর ১৭৩ থেকে ১৭৭, প্রকাশনা: মাকতাবায়ে থানবি, দেওবন্দ।

হজরত আবু বকরের ইন্তেকালের পর কপিটি হজরত উমর রা. নিজের কাছে রাখেন। হজরত উমরের ইন্তেকালের পর কপিটি তাঁর মেয়ে হজরত হাফসা রা.-এর কাছে রাখা হয়।[১০]

উমর রা.-এর মৃত্যুর পর হজরত উসমানের খেলাফতযুগের সূচনা হয়। হজরত উসমান রা.-এর খেলাফতের সীমানা ফ্রান্স ও ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এবং সেসব এলাকায় সাহাবিগণের সংখ্যা কম হওয়ায় সাধারণ মানুষজন না বুঝেই কুরআনের কেরাতের ভিন্নতার পদ্ধতিগুলো নিয়ে মতপার্থক্য শুরু করে।

তখন হজরত উসমান রা. সাহাবিগণের পরামর্শক্রমে হজরত যায়দ বিন সাবিতসহ আরও তিনজন সাহাবিকে কুরআনকে মূল পাণ্ডুলিপি (হজরত আবু বকরের সংকলিত পাণ্ডুলিপি) থেকে কুরাইশি লিখনশৈলীতে অনুলিপি করার নির্দেশ দেন। এবং উক্ত কাজে হজরত যায়দ বিন সাবিত রা. ও তাঁর সাথীগণের সাথে হজরত উবাই ইবনে কাব, হজরত আনাস ও হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.ও শরিক ছিলেন। তাঁরা সকলেই কুরআনের সুরাসমূহের বিন্যাস ঠিক করে কুরাইশি লিখনশৈলীতে লিপিবদ্ধ করে তার কয়েকটি কপি করেন। হজরত উসমান রা. সেসব কপি বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে কপির লিখনশৈলী অনুযায়ী কুরআন পাঠ করতে নির্দেশ দেন।

প্রথমত : এখানে দেখা যাচ্ছে, হজরত উসমান রা. কুরআনকে নতুনভাবে সংকলন করেননি; বরং হজরত আবু বকর রা.-এর সংকলিত পাণ্ডুলিপির অনুলিপি করিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত : কুরআনকে অনুলিপি করার দায়িত্ব তিনি সেই যায়দ বিন সাবিত রা.-কেই দেন, যিনি প্রথমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে কুরআন লিখতেন এবং তারপর হজরত আবু বকর রা.ও যাকে দিয়ে কুরআন সংকলন করিয়েছিলেন।

এবং তাঁর সাথে হজরত উবাই ইবনে কাব ও আনাস বিন মালিক রা.ও অনুলিপিতে শরিক ছিলেন। তাই জনাব শাহিনুর রহমান শাহিনের এই কথাটি—*'অথচ ওপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আনাস বিন মালিক ও উবাই বিন কাবের মতো সাহাবি উসমানের কোরানের বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন'* মিথ্যাচারের কোন প্রকারে পড়ে, তা আপনারাই ঠিক করে নিন।

---

[১০] *আল-ইতকান*: খণ্ড নম্বর ১, পৃষ্ঠা নম্বর ১৮৬-১৮৭। *আত-তিবয়ান ফি উলূমিল কুরআন*: ড. মুহাম্মাদ আলি আস-সাবুনি, চতুর্থ অধ্যায়, *উলুমুল কুরআন*: জাস্টিস তাকি উসমানি, পৃষ্ঠা নম্বর ১৮১ থেকে ১৮৭।

আফসোস! এরা কীভাবে বিকৃতরূপে এত মিথ্যাচার করতে পারে! সবচে বেশি আফসোস লাগে তখন, যখন দেখি এসব মিথ্যাবাদী মূর্খরাই 'বড় পণ্ডিত' সেজে মুক্তচিন্তার আওয়াজ তুলে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়িয়ে দুনিয়াকে বাঁচানোর টেন্ডার নেয়।[১১]

তৃতীয়ত : হজরত উসমান রা.-এর কুরআনকে কুরাইশি লিখনশৈলীতে অনুলিপির ব্যাপারে কোন সাহাবির মতপার্থক্য ছিল না; যা হজরত আলি রা.-এর ভাষ্য থেকে পাওয়া যায়। তিনি হজরত উসমান রা.-এর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন—'তোমরা হজরত উসমানের ব্যাপারে ভালো কথা ছাড়া কিছুই বলবে না। আল্লাহর শপথ! তিনি কুরআনের বেলায় যা করেছেন তা আমাদের সামনেই করেছেন।'[১২]

জনাব শাহিনুর রহমান শাহিন তার লেখায় আব্দুল্লাহ ইবনে উমর এবং আয়িশা রা.-এর যে অভিমত উদ্ধৃত করেছেন, সেখানেও তিনি সূক্ষ্মভাবে কারচুপি করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর কথাটি মূলত নসখ সম্পর্কে। আর হজরত আয়িশা রা.-এর মন্তব্য নসখের সেই প্রকার সম্পর্কে, যার তিলাওয়াত এবং হুকুম উভয়ই মানসুখ হয়ে গেছে। 'সংশয়বাদ' শিরোনামের অধীনে এ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

সূত্র পর্যালোচনা

ক) "*আল-ইতকান*: ২য় খণ্ড, ১১-১৫ পৃষ্ঠা।"
- উক্ত পৃষ্ঠাগুলোতে নাসিখ-মানসুখের আলোচনায় হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর এবং হজরত আয়িশা রা.-এর মন্তব্যদ্বয় নিয়ে আসা হয়েছে।

খ) "*কোরআন হাদিস সংকলনের ইতিহাস*: ৮১ পৃষ্ঠা; *সহিহ মুসলিম*: ৬১৪৫ নম্বর হাদিস।"
- উক্ত পৃষ্ঠায় হজরত আনাস রা.-এর ইন্তেকালের তারিখসহ এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাহাবিগণ কীভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস সংগ্রহ করতেন।

গ) "*সহিহ বুখারি*: ৩৪৮৮, ৩৫৩৬-৩৭, ৪৫৯৫-৯৬ ও ৪৬৩৭ নম্বর হাদিস।"
- উক্ত হাদিসগুলোতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের কাছ থেকে কুরআন শিক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁদের নাম উল্লেখিত আছে। উদাহরণস্বরূপ ৩৪৮৮ নম্বর হাদিসটি—আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'তোমরা চার ব্যক্তির নিকট হতে কুরআন শিক্ষা করো : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উবাই ইবনে কাব, মুআজ ইবনে জাবাল, সালিম মাওলা আবি হুযাইফা।'

ঘ) "*সহিহ মুসলিম*: ৬১৪৮-৪৯ নম্বর হাদিস।"
- উক্ত হাদিসদ্বয়ে হজরত আনাস রা.-এর ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

---

[১১] *আল-ইতকান*: পৃষ্ঠা নম্বর ১৯০ থেকে ১৯২, খণ্ড নম্বর ১। *উলুমুল কুরআন*: জাস্টিস তাকি উসমানি, পৃষ্ঠা নম্বর ১৮৭ থেকে ১৯২।
[১২] *ফাতহুল বারি*: পৃষ্ঠা নম্বর ১৫ খণ্ড নম্বর ৯।

-এই হাদিসগুলো তার (শাহিনের) মূল আপত্তির ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু তিনি তার লম্বাচওড়া আলোচনার দলিল হিসেবে এগুলো নিয়ে এসেছেন। যাতে করে তার কথার স্বপক্ষে বেশি দলিল দেখা যায়। আর এ কাজটি তিনি প্রায় সব জায়গাই করেছেন।

(দ্র: পৃথক পৃথক আয়াতগুলোর ব্যাপারে জানতে এগারো নম্বর পয়েন্ট দেখুন। এবং কেরাতের ভিন্নতার পার্থক্য ও লিখনশৈলী সম্পর্কে জানতে চৌদ্দ নম্বর পয়েন্টে আলোচনা দেখুন।)

চার :

'প্রতিটি মুসলমানের কাছেও "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বাক্য। এই বাক্যটি কোরানের আয়াত কি না, এটা নিয়েও প্রচুর দ্বন্দ্ব রয়েছে। নবিপত্নী উম্মে সালমা, খলিফা আলি, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবু হুরাইরা প্রমুখের মতে এটি প্রতিটি সুরার প্রথম আয়াত (সুরা তাওবা বাদে)। অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের মতে, এটি কোরানের কোন আয়াত নয়। ইমাম শাফেয়ি বলেন, এটি শুধু সুরা ফাতিহার আয়াত।

সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ছিলেন নবি মুহাম্মদের চাচাত ভাই। তিনি তৃতীয় সর্বাধিক হাদিস (১৬৬০টি) বর্ণনা করেছেন। স্বয়ং নবি মুহাম্মদ তাকে জ্ঞান দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। খলিফা আলির সময়ে তিনি বসরার শাসক ছিলেন।

আবু হুরাইরা ছিলেন আহলে সুফফার সদস্য, যিনি সর্বাধিক সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি বাহরাইন ও মদিনার শাসনকর্তা হিসেবেও দায়িত্বপালন করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ি সুন্নি ইসলামের চার মাযহাবের মধ্যে তিনটি মাযহাবের প্রবর্তন করেন। এদের প্রভাব নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। *তাফসিরে ইবনে কাসির : ১ম খণ্ড, ৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা। আল-ইতকান : ২য় খণ্ড, ০১ পৃষ্ঠা; সহিহ মুসলিম ৬১৪৪ নম্বর হাদিস। কোরআন হাদিস সংকলনের ইতিহাস : ৮১ পৃষ্ঠা।'*

উত্তর :

কী লিখব, কীভাবে লিখব বুঝতে পারছি না। কারণ, তার এই আপত্তিটা পড়ে বিস্ময় চোখ চড়কগাছ! ফেবুপাড়ার ওই হা হা রিএক্টের মতই আরকি! যাক, বেচারা বললেন, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' কুরআনের আয়াত কি না তা নিয়ে প্রচুর

দ্বন্দ্ব রয়েছে। প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করলেন— *'নবিপত্নী উম্মে সালমা, খলিফা আলি, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবু হুরাইরা প্রমুখের মতে এটি প্রতিটি সুরার প্রথম আয়াত (সুরা তাওবা বাদে)।'*

দেখা যাচ্ছে সাহাবিগণ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'কে কুরআনের আয়াত বলে মানতেন। তাহলে তিনি দ্বন্দ্ব কোথায় পেলেন?

এরপর তিনি বললেন—'অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের মতে, এটি কোরানের কোন আয়াত নয়।' এই কথাটিতেও তার মূর্খতা টপটপিয়ে ঝরে পড়ছে! কেননা, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকসহ সবাই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'কে কুরআনের আয়াত মানেন। কারণ, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সুরা নামলের ত্রিশ নম্বর আয়াতেই আছে। তবে তাদের মতপার্থক্য শুধু একটি জায়গায় যে, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' প্রতিটি সুরার প্রথম আয়াত কি না—তা নিয়ে। গ্রহণযোগ্য সূত্র অনুযায়ী 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' প্রতিটি সুরার আয়াত নয়; বরং একটি সুরাকে অন্য সুরা থেকে পৃথক করার জন্য প্রতিটি সুরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'কে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩] তবে তা কুরআনেরই অংশ। সুরা নামলের অংশ তো রয়েছেই, এ ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে তা কুরআনের অংশ। তবে কোনো নির্দিষ্ট সুরার সঙ্গে বিশেষিত নয়।

সূত্র পর্যালোচনা

ক) "*তাফসিরে ইবনে কাসির*: ১ম খণ্ড, ৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা।"
-ইবনে কাসিরের উক্ত পৃষ্ঠাগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'সকল সাহাবি আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজিদকে বিসমিল্লাহ দ্বারা আরম্ভ করেছেন। এবং আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, তা সুরা নামলেরই একটি আয়াত।' এরপর বিসমিল্লাহ প্রতিটি সুরার আলাদা একটি আয়াত কি না সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খ) "*আল-ইতকান*: ২য় খণ্ড ০১ পৃষ্ঠা; সহিহ মুসলিম : ৬১৪৪ নম্বর হাদিস।"
- ইবনে কাসিরে উল্লেখিত আলোচনাটিই আল-ইতকানে করা হয়েছে।

গ) "*কোরআন হাদিস সংকলনের ইতিহাস*: ৮১ পৃষ্ঠা।"
- উক্ত পৃষ্ঠায় হজরত আবু হুরাইরা এবং হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.মার ইন্তেকালের তারিখসহ এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা কে কোথায় হাদিসের প্রশিক্ষণ দিতেন।

---

[১৩] *আল-ইতকান*: খণ্ড নম্বর ০১, পৃষ্ঠা নম্বর ৩০৮। দারুল হাদিস, কায়রো, মিসর।

পাঁচ :

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাশালী একজন সাহাবি। তিনিই বিখ্যাত আবু জেহেলকে হত্যা করেছেন। উবাই বিন কাবের পাশাপাশি তিনিও সেই চারজনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, নবি মুহাম্মদ যাদের কাছে কোরান শিক্ষা নিতে বলেছিলেন। তিনি উসমান-কর্তৃক সংকলিত কোরানের প্রচণ্ড সমালোচনা করেছেন। নিজের সংকলিত কোরানে তিনি সুরা ফাতিহা রাখেননি। অথচ এটি আমাদের কাছে সবচেয়ে পরিচিত সুরা! *তাফসিরে ইবনে কাসির : ১ম খণ্ড ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা। সহিহ বুখারি : ৩৪৮৮, ৩৫৩৬, ৪৬৩৪ ও ৪৬৩৬ নম্বর হাদিস। উইকিপিডিয়া।'*

ছয় :

'সুরা নাস ও সুরা ফালাককে একত্রে 'মুআওইযাতাইন' বলা হয়। সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মতে, এটি কোরানের অংশ নয়। নিজের কোরানে তিনি এই সুরা দুটোকে কোনো স্থান দেননি। *তাফসিরে ইবনে কাসির : ১৮শ খণ্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা। তাফহিমুল কোরান : ১৯শ খণ্ড, ৩২০-২১ পৃষ্ঠা। সহিহ বুখারি : ৪৬১৩ নম্বর হাদিস।'*

উত্তর

ইসলাম সম্পর্কে মুক্তমনা-নামধারী এইসব নাস্তিকের জ্ঞান দেখে আমার আফসোস হয়! এই জ্ঞান নিয়ে এরা কীভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে! কীভাবেই-বা কলম ধরে!

তিনি পাঁচ নম্বর পয়েন্টে বললেন, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হজরত উসমানের সংকলিত কুরআনের প্রচণ্ড সমালোচনা করেছেন এবং এ জন্য নিজের সংকলিত কুরআনে সুরা ফাতিহা রাখেননি।

আবার ছয় নম্বর পয়েন্টে তার মূর্খতার পণ্ডিতি দেখিয়ে বললেন, *'সুরা নাস ও সুরা ফালাককে একত্রে 'মুআওইযাতাইন' বলা হয়। সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মতে, এটি কোরানের অংশ নয়।'*

প্রথমত : সেই সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস নন; বরং তিনিও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ।

দ্বিতীয়ত : হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সুরা ফাতিহা এবং সুরা নাস ও সুরা ফালাককে কুরআনের অংশ মানতেন; যেভাবে পুরো উম্মাহর সকল লোক এগুলোকে কুরআনের অংশ মানে। কেরাতে আশারার মধ্য থেকে হজরত আসিম রাহিমাহুল্লাহ, হজরত আব্দুর রাহমান সুল্লামি, হজরত আবু উমার শাইবানিসহ

আরও অনেকেই তা বর্ণনা করেছেন। তাঁরা সকলেই হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকেই কেরাত বর্ণনা করেন। আর মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, কেরাতে আশারায় যে সকল সূত্র বর্ণনা করা হয়েছে, তার সবই পুরো দুনিয়ার গ্রহণযোগ্য বর্ণনাগুলোর মধ্য থেকে একটি। এবং হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. 'মুআওইযাতাইন'কে না মানার ব্যাপারে একটি সূত্র পাওয়া যায় আর সে সূত্রটি খুবই দুর্বল। মুহাদ্দিসগণ তা অগ্রহণীয় বলেছেন।[১৪]

সুরা ফাতিহাকে তাঁর সংকলিত কুরআনে না রাখার ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'যদি আমি আমার কুরআনের শুরুতে সুরা ফাতিহা রাখতাম, তাহলে প্রতিটি সুরার শুরুতেই আমি সুরা ফাতিহাকে রাখতাম।' অর্থাৎ 'সুরা ফাতিহা বহুল প্রসিদ্ধ হওয়ায় এবং সকলের মুখস্থ থাকায় তাকে আমি আমার কুরআনে রাখিনি। কারণ, প্রতিদিন পাঁচবার নামাজেই তো সবাই সুরা ফাতিহাকে পড়ে।' (এবং একই কারণে তিনি 'মুআওইযাতাইন'কে নিজ কুরআনে রাখেননি) এ কথাটি *তাফসিরে ইবনে কাসির*-এর ৫৬ নম্বর পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত আছে। অর্ধেক কথা উল্লেখ করে বাকিটা গোপন করে মিথ্যাচার করে এটা বলা যে, ইবনে মাসউদ হজরত উসমানের সংকলিত কুরআনের প্রচণ্ড সমালোচনা করেছেন, তা কি কোনো সুস্থ মানুষের কাজ হতে পারে?[১৫]

নিঃসন্দেহে এইসব নাস্তিকরা মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত।

সূত্র পর্যালোচনা

পাঁচ-ছয় :

০১) *তাফসিরে ইবনে কাসির* : ১ম খণ্ড ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা। - মূল পয়েন্টে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছি, তা-ই ইবনে কাসিরের উক্ত পৃষ্ঠাগুলোতে আছে।

০২) *সহিহ বুখারি* : ৩৪৮৮, ৩৫৩৬, ৪৬৩৪ ও ৪৬৩৬ নম্বর হাদিস। - প্রথম দুটি হাদিস তিন নম্বর পয়েন্টের রেফারেন্সের উত্তরে রয়েছে। বাকি দুটি হাদিস একই বিষয়ে। যেমন : ৪৬৩৬ নম্বর হাদিসটিতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের বর্ণনা রয়েছে। যাতে তিনি বলেছেন, কুরআনের সুরা এবং আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট তিনি জানেন।

ক) *তাফসিরে ইবনে কাসির* : ১৮শ খণ্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা। - মূল পয়েন্টে যা উল্লেখ করেছি, তাই ইবনে কাসিরে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ) *তাফহিমুল কোরান* : ১৯শ খণ্ড, ৩২০-২১ পৃষ্ঠা। - বাহ! নাস্তিকরা জীবনভর যে জামাতে ইসলামির বিরোধিতা করল, প্রমাণ হিসেবে সেই জামাতে ইসলামির প্রতিষ্ঠাতার লিখিত বইয়ের

---

[১৪] *আন-নাশরু ফিল কিরাআতিল আশর* : পৃষ্ঠা নম্বর ১৫৬-১৬৬ খণ্ড নম্বর ০১। *উলুমুল কুরআন*, তাকি উসমানি: ২২৩-২২৬।

[১৫] *তাফসিরে কুরতুবি* : পৃষ্ঠা নম্বর ১১৪-১১৫ খণ্ড নম্বর ০১। *উলুমুল কুরআন* : পৃষ্ঠা নম্বর ২২৬-২২৭।

রেফারেন্স নিয়ে আসল! উক্ত পৃষ্ঠাগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে সেই একই আলোচনা—অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এদুটি সুরাকে কুরআনের অংশ মানতে কি মানতেন না।

গ) সহিহ বুখারি: ৪৬১৩ নম্বর হাদিস। -উক্ত হাদিসটি তাফসির (কুরআনের ব্যাখ্যা) সম্পর্কে। উক্ত হাদিসে উবাই ইবনে কাব এবং ইবনে মাসউদ বলেন, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছি, তাই বলেছি।

সাত :

'আবু মুসা আশআরি ছিলেন বিখ্যাত একজন সাহাবি। তিনি কুফা ও বসরার শাসক ছিলেন। রক্তক্ষয়ী সিফফিনের যুদ্ধের শেষে শান্তি আলোচনায় তিনি আলির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি বলেছেন, সুরা তওবা তথা বারাআতের মতো বড় আকারের একটি সুরা বাদ পড়ে গেছে। সুরা তাওবায় ১২৯টি আয়াত রয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, মুসাব্বিহাত (যেসব সুরার শুরুতে সাব্বাহা/ইউসাব্বিহু রয়েছে)-এর সমপরিমাণ একটি সুরা আগে তারা পাঠ করতেন। সেটি এখন তাদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। *সহিহ মুসলিম : ২২৯০ নম্বর হাদিস। আল-ইতকান : ১ম খণ্ড ১৩ পৃষ্ঠা।'*

আট :

'সাহাবি হুজাইফা ইবনে ইয়ামান কুফা ও মাদায়েনের শাসক ছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, বর্তমান কোরানে যে সুরা বারা'আত বা তাওবা পাঠ করা হয়, তা প্রকৃত সুরার এক-চতুর্থাংশ মাত্র। আল-ইতকান : ২য় খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা।'

নয় :

'কোরানের বৃহত্তম সুরা হচ্ছে সুরা বাকারা। এখানে ২৮৬টি আয়াত আছে। আর সুরা আহযাবে ৭৩টি আয়াত রয়েছে। কিন্তু সাহাবি উবাই বিন কাব বলেছেন, সুরা আহযাবের আকার ছিল প্রায় সুরা বাকারার মতো। অবশিষ্ট আয়াতের ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন যে, খলিফা উসমান এগুলো সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন; আবার কেউ কেউ বলেছেন, এগুলো সম্ভবত আল্লাহর আদেশে রহিত হয়ে গেছে। *তাফসিরে ইবনে কাসির : ১৫শ খণ্ড, ৭৩৩ পৃষ্ঠা। আল-ইতকান : ২য় খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা।'*

দশ :

'সুরা আল-খুলা' ও আল-হাফদ নামের দুটি সুরা প্রচলিত কোরানের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। আরেক জায়গায় পড়েছিলাম, এই সুরা দুটি উবাই বিন কাবের কোরানে ছিল। *আল-ইতকান ১ম খণ্ড ১৫ পৃষ্ঠা।'*

উত্তর :

সাত, আট, নয়, দশ—উক্ত পয়েন্টগুলোতে বর্ণিত সুরা-আয়াতসমূহ নসখের প্রথম প্রকার—অর্থাৎ যার তিলাওয়াত ও হুকুম উভয় মানসুখ হয়ে গেছে—এর অন্তর্ভুক্ত। বিস্তারিত ১৯০ পৃষ্ঠায় নসখের আলোচনায় দেখুন।

এগারো :

'অসংখ্য সহিহ হাদিসে খলিফা উমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, বর্তমান কোরানে ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ পাথর মেরে হত্যা করা সংশ্লিষ্ট রজমের আয়াত উল্লেখ করা হয়নি। *সহিহ মুসলিম : ৪২৬৯ ও ৪২৭১ নম্বর হাদিস। সুনানে আবু দাউদ : ৪৩৬৫ নম্বর হাদিস। সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৫৫৩ নম্বর হাদিস। আল-ইতকান : ২য় খণ্ড ১৬ পৃষ্ঠা।'*

উত্তর :

আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি হজরত উসমান রা. আলাদা করে নতুনভাবে কুরআন সংকলন করেননি; বরং হজরত আবু বকর রা.-এর সংকলিত কুরআনের পাণ্ডুলিপি থেকে অনুলিপি করান। আর হজরত আবু বকর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাতিবে ওয়াহি (কুরআন লেখক) হজরত যায়িদ বিন সাবিত রা.-কে ডেকে কুরআনকে পাণ্ডুলিপিরূপে একত্র করার নির্দেশ দেন।

এবং এই কাজে হজরত যায়িদ বিন সাবিতের সাথে হজরত উমর রা.ও যোগ দেন। হজরত যায়িদ বিন সাবিত কুরআনের বিক্ষিপ্ত থাকা আয়াতগুলোকে খুঁজে খুঁজে একত্র করেন। এবং প্রতিটি আয়াতকে গ্রহণ করার সময় তিনি সতর্কতামূলক চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

১. প্রথমে তিনি নিজের মুখস্থে থাকা আয়াতের সাথে লিখিত আয়াতকে মিলিয়ে দেখতেন।

২. হজরত উমর রা.ও তাঁর মুখস্থে থাকা আয়াতের সাথে লিখিত আয়াতকে মিলিয়ে দেখতেন।

৩. সে আয়াত আরও দুজন সাহাবির মুখস্থ আছে কি না—তাও দেখতেন। যে আয়াতের ব্যাপারে দুজন সাহাবি এই বলে সাক্ষ্য না দিতেন যে, এই আয়াত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে লিপিবদ্ধ হয়নি, সে আয়াত তাঁরা গ্রহণ করতেন না।

৪. সে আয়াতকে অন্যান্য সাহাবিগণের লিখিত আয়াতের সাথে মিলিয়ে দেখতেন।

হজরত উমর রা.-এর বর্ণিত আয়াত উক্ত পদ্ধতিতেও পরীক্ষা করা হয়, কিন্তু সে আয়াত হজরত উমর ব্যতীত অন্য কোনো সাহাবির নিকট পাওয়া যায়নি, তাই উক্ত আয়াত কুরআনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

এখানে একটি বিষয় খুব লক্ষণীয়, হজরত যায়িদ বিন সাবিত রা. কুরআন সংকলনে কত সতর্ক ছিলেন যে, হজরত উমর রা.-এর মতো শীর্ষ সাহাবি—যাকে প্রায় সকলেই ভয় পেতেন এবং যিনি দ্বিতীয় খলীফা হিসেবে অর্ধেক পৃথিবী শাসন করেছেন—তাঁর মতো মানুষের বর্ণিত আয়াতও কুরআনে অন্তর্ভুক্ত করেননি, সাক্ষী না পাওয়ার কারণে।[১৬]

সূত্র পর্যালোচনা

ক) *সহিহ মুসলিম*: ৪২৬৯ ও ৪২৭১ নম্বর হাদিস।

খ) *সুনানে আবু দাউদ*: ৪৩৬৫ নম্বর হাদিস।

গ) *সুনানে ইবনে মাজাহ*: ২৫৫৩ নম্বর হাদিস। -উক্ত হাদিসগুলোতে ব্যভিচারের শাস্তির কথা উল্লেখিত।

ঘ) আল-ইতকান : ২য় খণ্ড, ১৬ পৃষ্ঠা। -হজরত উমরের আয়াত কেন গ্রহণ করা হয়নি, তার বর্ণনা উল্লেখিত।

বারো :

> 'নবিপত্নী আয়িশা কর্তৃক একটি মজার হাদিসের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বয়স্ক লোকের দশ ঢোক দুধ পানের মাধ্যমে কোন মহিলাকে মাহরাম এবং ব্যভিচারের কারনে পাথর মেরে হত্যা করা সম্পর্কিত আয়াত নাকি কাগজে লেখা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এই আয়াত ছাগলে খেয়ে ফেলে। এই কারণে এগুলো আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, যা চিরতরে হারিয়ে যায়। *সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৯৪৪ নম্বর হাদিস।*'

---

[১৬] *আত-তিবয়ান* : পৃষ্ঠা নম্বর ১৩৮-১৩৯। *আল-ইতকান* : পৃষ্ঠা নম্বর ১৯০-১৯২ খণ্ড নম্বর ০১। *উলুমুল কুরআন* : ১৮৭-১৯২।

উত্তর :

হজরত আয়িশা রা. কর্তৃক যে আয়াতগুলোর কথা এসেছে, আলেমগণের ঐকমত্যে তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায়ই মানসুখ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি হজরত আয়িশা রা.-এর মতেও উক্ত আয়াতগুলো মানসুখ। হজরত আয়িশা রা. শুধু স্মৃতিস্বরূপ উক্ত আয়াতগুলো রেখে দিয়েছিলেন। কেননা, তাঁর মতে যদি উক্ত আয়াতগুলো প্রচলিত কুরআনের অংশ হতো, তাহলে তিনি তা কুরআনে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তিনি গোটা জীবনে তা করেননি। আর এতেই বোঝা যায় যে, হজরত আয়িশা রা.-এর নিকটও উক্ত আয়াতগুলো প্রচলিত কুরআনের অংশ ছিল না।

একটি বিষয় মাথায় রাখা দরকার, সাহাবিগণ কুরআনের হাফিজ ছিলেন। কোনো আয়াতের লিখিত অংশ হারিয়ে গেলেও তা তাঁদের মুখস্থ থাকত। কিন্তু হাদিসে হজরত আয়িশার বর্ণনার সাথে সেই আয়াতের উল্লেখ নেই। যদি উক্ত আয়াতগুলো মানসুখ না হতো, তাহলে অবশ্যই হজরত আয়িশা রা. উক্ত ঘটনার সাথে সাথে আয়াতটিও বর্ণনা করতেন।[১৭]

তেরো :

> 'খলিফা উসমানের কোরান অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাকরণের নিয়ম-কানুনের সাথে সাংঘর্ষিক। তিনি নিজে ব্যাপারটি স্বীকার করেছেন এই বলে যে, উচ্চারনের সময় সঠিকভাবে উচ্চারণ করা হবে! *আল-ইতকান : ৪র্থ খণ্ড ১৪৬ পৃষ্ঠা। তাফসিরে মাযহারি : ৩৪৮-৪৯ পৃষ্ঠা।'*

উত্তর :

আজিব! বড় আজিব কথা!

হজরত উসমান রা. এক বিদগ্ধ জামাতের মাধ্যমে কুরআনের সাতটি কপি করিয়েছিলেন। একই সাথে একই জায়গায় এতজন মানুষ কীভাবে সাতটি কপিতেই ভুল করে বসলেন?

হজরত উসমান রা.-এর মতো মানুষের ব্যাপারে কীভাবে এই ধারণা করা যায় যে, তিনি কুরআনে ব্যাকরণগত ভুলের কথা শুধু স্বীকারই করেননি, বরং ভুলটিকে শুদ্ধ করতেও নিষেধ করেছেন!

---

[১৭] *উলুমুল কুরআন*, তাকি উসমানি : পৃষ্ঠা নম্বর ২২১।

উসমান রা.-এর যুগে হাজার হাজার সাহাবি জীবিত ছিলেন, তাঁদের ব্যাপারেই বা এই ধারণা কীভাবে করা যায় যে, কুরআনে ব্যাকরণগত ভুল দেখার পরও তাঁরা সবাই চুপ থেকে ভুলটিকে মেনে নিয়েছেন! মূলত যে সূত্রে হজরত উসমানের স্বীকারোক্তিসহ ব্যাকরণগত ভুলের কথা উল্লেখ হয়েছে, তা ভিত্তিহীন। মুহাদ্দিসগণ সে সূত্রকে ভিত্তিহীন বলেছেন।[১৮]

সূত্র পর্যালোচনা

০১) *আল-ইতকান*: ৪র্থ খণ্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা।

০২) *তাফসিরে মাযহারি*: ৩৪৮-৪৯ পৃষ্ঠা।

-আল ইতকানে মূল পয়েন্টের আলোচনাটাই উল্লেখিত। এবং তাফসিরে মাযহারিতে সুরা নিসার ১৬২ নম্বর আয়াতে ব্যাকরণগত ভুলের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা ব্যাকরণগত দিক দিয়ে শুধু একভাবেই শুদ্ধ নয়; বরং কয়েকভাবেই তা শুদ্ধ। আরবি ব্যাকরণবিদগণের নেতা সিবওয়াই রা.-সহ অনেকেই তা প্রমাণসহ বর্ণনা করেছেন।

যেমন সিবওয়াই রাহি. বলেন—

لكن الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ مِنْهُمْ وَالمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

উক্ত আয়াতে ওয়াল মুকিমিনাস সালাহ'তে নসব হয়েছে মাদাহ (مدح) এর ভিত্তিতে এবং তার পূর্বে أعني ফে'ল উহ্য রয়েছে। কেননা, আরবি ভাষায় মাদাহ-এর ওপর নসব হয় কোনো সূক্ষ্ম জিনিস বোঝানোর জন্য। আর এখানেও একটি সুক্ষ্ম কথা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তার অর্থ হলো—

أو أخص المقيمين الصلوة الذين يؤدونها على وجه الكمال

চৌদ্দ :

'নবি মুহাম্মদের সময়কার হেজাজে প্রভাবশালী গোত্র ছিল সাতটি। তাদের নিজেদের আঞ্চলিক ভাষা ছিল। তারা কোরান পাঠ করত নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষায়। এবং তাদের মধ্যকার গোত্রকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব ছিল দেখার মতো। সম্ভবত এই দ্বন্দ্ব/কোন্দল দূর করতে নবি মুহাম্মদ বলেছেন, কোরান সাতটি আঞ্চলিক ভাষায়ই অবতীর্ণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিভেদ আরও চরমে ওঠে। এক কেরাতের অনুসারীগণ অন্য কেরাতের অনুসারীদের কাফের বলে আখ্যায়িত করতে শুরু করে। খলিফা উসমান তখন অন্য ভাষাগুলো বাতিল করে দিয়ে কুরাইশদের ভাষায় কোরান সংকলনের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য যে,

---

[১৮] *ইরাবুল কুরআন*: উক্ত আয়াতের তারকিব দ্রষ্টব্য। *আল-ইতকান*: খণ্ড নম্বর ২, পৃষ্ঠা নম্বর ৫৭১-৫৭২।

উসমান নিজে ছিলেন কুরাইশি এবং কুরাইশ গোত্র ছিল তৎকালীন হেজাজের সর্বাধিক প্রভাবশালী গোত্র। *সহিহ বুখারি : ৩২৫৬, ৪৬১৯, ৪৬২৬, ৪৬৭২ ও ৪৬৯২ নম্বর হাদিস। সহিহ মুসলিম : ১৭৭২ নম্বর হাদিস। তাফসিরে জালালাইন : ১ম খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।*'

উত্তর :

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় আমার রব যেকোনো এক 'হরফে' কুরআন পাঠ করার আদেশ দান করেন। আমি আমার উম্মতের ওপর সহজ করার জন্য আবেদন করলাম। তখন আল্লাহ তাআলা আমাকে দুটি 'হরফে' কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দেন। আমি আবারও তাঁর কাছে আমার উম্মতের ওপর সহজ করার জন্য আবেদন করলাম। তখন তিনি সাতটি 'হরফে' কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দেন।'[১৯]

মুসলিম শরিফের উক্ত হাদিসে দেখা যাচ্ছে কুরআন শরিফ সাত হরফের মধ্য থেকে এক হরফে পড়লে যথেষ্ট হবে। এই 'হরফ' দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

সবচে গ্রহণযোগ্য মত হলো, হরফ দ্বারা উদ্দেশ্য কেরাতের ভিন্নতার সাত প্রকার। অর্থাৎ, কেরাত সাতের অধিক হলেও কেরাতের মধ্যে যেসব মতপার্থক্য পাওয়া যায়, তা সাত প্রকারেই সীমাবদ্ধ।

ইমাম কুরুতুবি রহ. তার সুবিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ আলজামি' *লি-আহকামিল কুরআনে* সুরা মুযযামমিলের শেষ আয়াতের তাফসিরে প্রসঙ্গে এ বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'সাত হরফ দ্বারা কী উদ্দেশ্য এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে রয়েছে চরম ইখতিলাফ। *তাফসিরে ইবনে হিব্বানে* ইমামগণের পঁয়ত্রিশটি অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকাংশ আহলে ইলমের অভিমত—যাদের মাঝে রয়েছেন : সুফয়ান ইবনে উয়ায়না, আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহব, তাবারি, তহাবি রহ. সহ আরও অনেকে—তাদের বক্তব্য হলো, সাত হরফ দ্বারা সাত সুরত উদ্দেশ্য (অর্থাৎ, একটি শব্দকে একাধিক সুরতে পড়া। যেমন, 'নুনশিযুহা' শব্দকে 'নানশুরুহা' পড়া। সুরা বাকারা : ২৫৯); শব্দে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও যার সবগুলোর অর্থ কাছাকাছিই। এরপর তিনি এই বিশুদ্ধতম মতের পক্ষে দলিলসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। বিস্তারিত জানতে তাফসিরে কুরতুবি দ্রষ্টব্য।

আরও একটি উদাহরণ দিই। উদাহরণ দিলে আশা করি, বুঝতে সহজ হবে।

---

[১৯] *মুসলিম শরিফ* : হাদিস নম্বর ১৯৩৯।

যেমন : لايقبل এবং لاتقبل বাক্যটি। এখানে প্রথম বাক্যটি (লা-ইউকবালু) পুংলিঙ্গ আর অন্যটি (লা-তুকবালু) স্ত্রীলিঙ্গ এবং হাদিসের ভাষ্যমতে উভয়টি পড়া বৈধ। আর এটা হচ্ছে কেরাতের ভিন্নতার মাঝে যে সাত প্রকার মতপার্থক্য আছে, তার মধ্য থেকে একটি পার্থক্য।[২০]

তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে কুরআনকে কেন সাত হরফে পড়ার আবেদন জানালেন?

তার উত্তরও অন্য হাদিসে পাওয়া যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমাকে একটি অশিক্ষিত জাতির মাঝে প্রেরণ করা হয়েছে। যাদের মধ্যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী ও শিশুরাও রয়েছে। এবং তাদের মধ্যে এমন মানুষজনও রয়েছে, যারা কখনো কোন বই পড়েনি।'[২১]

এই যে একটি অশিক্ষিত জাতি, যাদের মধ্যে সব ধরনের লোক রয়েছে, তাদের সহজের জন্য কুরআনকে পড়ার এমন কিছু পদ্ধতি প্রয়োজন ছিল যে, তাদের মধ্য থেকে কেউ কোনো একটি শব্দকে একভাবে উচ্চারণ করতে না পারলে একই অর্থবোধক অন্য একটি শব্দ দিয়ে যেন তার উচ্চারণ আদায় করে নেয়; যাতে করে তার নামাজ, ইবাদত বিশুদ্ধ এবং সঠিক হয়ে যায়। ওপরে বর্ণিত উদাহরণে লক্ষ করে দেখুন, কোনো মানুষ যদি মুখের জড়তার জন্য 'ইউকবালু' উচ্চারণ করতে না পারে, তাহলে 'তুকবালু' পড়লেই 'ইউকবালু'র উচ্চারণ আদায় হয়ে যাবে। আর সাত হরফ দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য; আরবের গোত্রগুলোর ভাষাসমূহ উদ্দেশ্য নয়।

সাত হরফ কাকে বলে আমরা বুঝে গেলাম। এখন তার আপত্তি নিয়ে আলোচনা করি।

প্রথমত তিনি বললেন, *'নবি মুহাম্মদের সময়কার হেজাজে প্রভাবশালী গোত্র ছিল সাতটি।'*

বড় আফসোসের কথা! এরা ইতিহাসও ভালভাবে জানে না। আর এই জ্ঞান নিয়েই কিনা তারা কুরআনের স্ববিরোধিতা খুঁজে!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে হেজাজে প্রভাবশালী সাতটি গোত্র ছিল না; বরং সাতের অধিক গোত্র ছিল। যেমন : কুরাইশ, হুজাইল, রাবিআ, হাওয়াজিন, আজদ, সাদ বিন বকর, কেনানা, কাইস, আসাদ ইবনে খুজাইমাসহ আরও কয়েকটি প্রভাবশালী গোত্র ছিল।[২২]

---

[২০] *আল-ইতকান* : খণ্ড নম্বর ০১, পৃষ্ঠা নম্বর ১৫৭। *উলুমুল কুরআন* : পৃষ্ঠা নম্বর ১০৬ থেকে ১১০।
[২১] *জামিউত তিরমিযি* : খণ্ড নম্বর ২, পৃষ্ঠা নম্বর ১৩৮।
[২২] *আল-ইতকান* : পৃষ্ঠা নম্বর ১৬০ খণ্ড নম্বর ০১। *উলুমুল কুরআন* : পৃষ্ঠা নম্বর ১০১-১০২।

দ্বিতীয়ত তিনি বললেন, *'এই সাতটি গোত্রের ভাষা অনুযায়ী কুরআনকে সাত ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়।'* এ সম্পর্কে ওপরেই বলেছি যে, সাত হরফ দ্বারা সাত ভাষা উদ্দেশ্য নয়। যদি এইসব গোত্রগুলো নিজ নিজ গোত্রের ভাষায় কুরআন পাঠ করত, তাহলে হজরত হিশাম ইবনে হাকীমের কেরাত শুনে হজরত উমর রা. কেন দ্বিধায় পড়লেন? এ বিষয়ে বুখারি শরিফে এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত উমর রা. বলেন, 'আমি হিশাম ইবনে হাকিম ইবনে হিযামকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় সুরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনলাম। আমি লক্ষ করলাম যে, তিনি বিভিন্ন কেরাতে তা পাঠ করছেন, যা আল্লাহর রাসুল আমাকে শেখাননি। যার ফলে তাঁকে নামাজের মধ্যেই ধরতে উদ্যত হলাম। তবে আমি তাঁর নামাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করলাম। নামাজ শেষ হতেই তাঁর গলায় রুমাল পেঁচিয়ে ধরলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "এই মাত্র তোমাকে যা পাঠ করতে শুনলাম, তা তোমাকে কে শিখিয়েছে?" তিনি উত্তর দিলেন, "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরূপ শিখিয়েছেন।" আমি বললাম, "তুমি মিথ্যা বলছ!" আল্লাহর কসম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ভিন্ন কেরাতে তিলাওয়াত করা শিখিয়েছেন। এরপর আমি তাকে টেনে নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হলাম এবং বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল! আমি এই ব্যাক্তিকে ভিন্ন এক কেরাতে সুরা ফুরকান পাঠ করতে শুনেছি, যে কেরাতে আপনি আমাকে তিলাওয়াত করতে শেখাননি। অথচ আপনি আমাকে সুরা ফুরকান তিলাওয়াত শিখিয়েছেন।"

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে হিশাম! তিলাওয়াত করো।"

তখন আমি তাঁকে যে কেরাতে পাঠ করতে শুনেছি, তিনি সেই কেরাতেই পাঠ করলেন। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এভাবে কুরআন নাজিল হয়েছে।" অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে উমর! তিলাওয়াত করো।" তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যেভাবে শিখিয়েছিলেন, সেভাবে আমি তিলাওয়াত করলাম। এরপর তিনি বললেন, "কুরআন এভাবেই নাজিল হয়েছে।"

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বললেন, 'সাত কেরাতে পাঠ করার জন্য কুরআন নাজিল হয়েছে। সুতরাং এর মধ্যে যে কেরাত তোমার জন্য সহজ, সে কেরাতে পড়ো।'[২৩]

---

[২৩] *মুসলিম শরিফ*: হাদিস নম্বর ১৯৩৬

উক্ত হাদিসে দেখাই যাচ্ছে যে, হজরত হিশাম ইবনে হাকিমের কেরাত শুনে হজরত উমর দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন। কেননা, একই সুরা তিনি ভিন্ন কেরাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে থেকে শিখেছেন। অথচ হজরত হিশাম ইবনে হাকিম ও হজরত উমর রা. উভয়ই কুরাইশ গোত্রের লোক ছিলেন। সুতরাং এই কথার চেয়ে আর বড় হাস্যকর কথা হতে পারে যে, কুরআন হেজাজের সাত প্রভাবশালী গোত্রের ভাষা অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়েছে!

তৃতীয়ত তিনি বললেন, **'খলিফা উসমান তখন অন্য ভাষাগুলো বাতিল করে দিয়ে কুরাইশদের ভাষায় কোরান সংকলনের নির্দেশ দেন।'**

এটাও এই মূর্খ পণ্ডিতের মূর্খতা। ওপরেই বলেছি যে, কুরআন গোত্রসমূহের ভাষায় অবতীর্ণ হয়নি আর হজরত উসমান রা. কুরাইশি ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষা বাতিল করতে বলেননি; বরং হজরত উসমান রা. কুরাইশি লিখনশৈলীতে কুরআনকে মূল পাণ্ডুলিপি থেকে অনুলিপি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর উক্ত সাত কেরাতই কুরাইশি লিখনশৈলীতে অন্তর্ভুক্ত আছে। যেমন : ننسرها বাক্যটি। কুরাইশি লিখনশৈলী অনুযায়ী প্রতিটি শব্দকে এভাবে জবর, জের, পেশ (হরকত) ছাড়া লেখা হয়। যাতে করে কুরআনকে সাত কেরাতেই পড়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ওই ننسرها বাক্যটি; তার মধ্যে হরকত ও নুকতা লাগালে নিম্নের দুই কেরাতেও পড়া যায়-

ننشرها ও ننشزها

এই উভয় কেরাতই সঠিক। যার জন্য যে কেরাতটি উচ্চারণ করতে সহজ হয়, সে কেরাতটি উচ্চারণ করলেই যথেষ্ট হবে।[২৪]

সূত্র পর্যালোচনা

ক) *সহিহ বুখারি*: ৩২৫৬, ৪৬১৯, ৪৬২৬, ৪৬৭২ ও ৪৬৯২ নম্বর হাদিস।

খ) *সহিহ মুসলিম*: ১৭৭২ নম্বর হাদিস।

- এই হাদীসগুলোতে সাত কেরাতের বিভিন্ন আলোচনা এসেছে।

গ) *তাফসিরে জালালাইন*: ১ম খণ্ড ২৬ পৃষ্ঠা।

- উক্ত পৃষ্ঠায় কুরআন সংকলনের সর্বশেষ পার্ট বর্ণনা করা হয়েছে।

---

[২৪] *উলুমুল কুরআন*: পৃষ্ঠা নম্বর ১৪৪-১৪৫। *আল-ফাউজুল কাবির*: শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি, পৃষ্ঠা নম্বর ২২৪। *আল-ইতকান*: পৃষ্ঠা নম্বর ১৬৫ খণ্ড নম্বর ০১।

পনেরো

'কোরানের ৯২ নম্বর সুরা হচ্ছে সুরা লাইল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু দারদা, আলকামা প্রমুখ সাহাবির মতে, সিরিয়াবাসীগণ এই সুরায় কিছু শব্দ যোগ করেছে, যা বর্তমান কোরানে পাঠ করা হচ্ছে। সুরা লাইলের ০৩ নম্বর আয়াতটি দেখলে ব্যাপারটি স্পষ্ট করে বোঝা যাবে। আবু দারদা চারজন সাহাবির একজন ছিলেন, যারা কোরান সংকলন করেছিলেন সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে। কিছু সময়ের জন্য তিনি সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। *সুরা লাইল : ১-৩ নম্বর আয়াত; সহিহ বুখারি : ৪৫৭৯ নম্বর হাদিস। তাফসিরে ইবনে কাসির : ১৮শ খণ্ড, ১৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা।*'

উত্তর :

সিরিয়ার লোকেরা নাকি সুরা লাইলে কিছু শব্দ যোগ করেছে! বড় আজিব কথা! সিরিয়াবাসীরা কিছু শব্দ যোগ করে কুরআন পরিবর্তন করে ফেলল আর সাহাবিগণ একদম নিশ্চুপ থাকলেন! এরচে আশ্চর্যজনক মিথ্যাচার আর কি হতে পারে?

মূলত ওপরের পয়েন্টে (চৌদ্দ নম্বর পয়েন্ট) সাত কেরাতের যে আলোচনা করেছিলাম, সুরা লাইলের তিন নম্বর আয়াতটি সেই সাত কেরাতে পাঠ করা যায়। আর হজরত আবু দারদা এবং হজরত ইবনে মাসউদ সুরা লাইলের তিন নম্বর আয়াতকে সেই সাত কেরাতের মধ্য থেকে এক কেরাতে পড়তেন, যা সবার কাছে পরিচিত কেরাত ছিল না। তাঁরা ব্যতীত বাকি সবাই সুরা লাইলের তিন নম্বর আয়াতকে আরেক কেরাতে পড়তেন এবং বর্তমানে আমাদের সামনে কুরআনে যে কপিটি আছে, তাতে তিন নম্বর আয়াতে সেই কেরাতটিই আছে।

তিনি বললেন, সুরা লাইলের তিন নম্বর আয়াতটি দেখলে নাকি স্পষ্ট বোঝা যাবে, তাতে কিছু শব্দ যোগ করা হয়েছে। আপনারা দেখে দেখুন তো, বুঝতে পারেন কি না। কেননা, আমি বুঝতে পারিনি।[২৫]

সূত্র পর্যালোচনা

ক) *সুরা লাইল*: ১-৩ নম্বর আয়াত; *সহিহ বুখারি*: ৪৫৭৯ নম্বর হাদিস।
- বুখারি শরিফের উক্ত হাদীসে হজরত আবু দারদা রাযি. এর কেরাতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

---

[২৫] *আল-ইতকান*: পৃষ্ঠা নম্বর ১৫৭ খণ্ড নম্বর ০১। *উলুমুল কুরআন*: পৃষ্ঠা নম্বর ১০৮।

ষোল :

'সুরা নুরের ২৭ নম্বর আয়াতে ভুল শব্দ রয়েছে। এই দাবি করেছেন সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও উবাই বিন কাব। এ ছাড়া সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদও তার কোরানে এই শব্দ সংশোধন করে এর স্থানে অন্য শব্দ লিখেছেন, যা বর্তমান কোরানে নেই। *সুরা নুর : ২৭ নম্বর আয়াত; তাফসিরে ইবনে কাসির : ১৫শ খণ্ড, ১৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা।*'

উত্তর :

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, উবাই বিন কাব এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সুরা নুরের ২৭ নম্বর আয়াতের একটি শব্দকে সাত কেরাতের এক কেরাতে পড়তেন। আর বাকিরা অন্য কেরাতে পড়তেন। আর যে সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর উক্তি বর্ণনা করা হয়ে, তা একদম দুর্বল উক্তি। তাফসিরে ইবনে কাসিরেও সেই দুর্বলতার কথাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে।[২৬]

সূত্র পর্যালোচনা

ক) সুরা নুর : ২৭ নম্বর আয়াত; তাফসিরে ইবনে কাসির : ১৫শ খণ্ড, ১৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা।
- মূল পয়েন্টে যে আলোচনা করেছি, তা বর্ণিত আছে ইবনে কাসিরের উক্ত পৃষ্ঠাগুলোতে।

সতেরো :

'মানসুখ বা রহিত হয়ে যাওয়া আয়াত নিয়ে উবাই বিন কাবের কোরানের সাথে বর্তমান কোরানের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। *সহিহ বুখারি : ৪১২৯ ও ৪৬৩৯ নম্বর হাদিস।*'

উত্তর :

ওপরে বলেছি যে, হজরত উসমান রা. সাহাবিগণের যে জামাতটিকে কুরাইশি লিখনশৈলীতে কুরআন অনুলিপি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে জামাতের সাথে হজরত উবাই ইবনে কাব রা.ও সম্পৃক্ত ছিলেন। যে কাজ নিজেই আঞ্জাম দিয়েছেন, সে কাজের বিরোধিতা উবাই ইবনে কাব নিজেই আবার কীভাবে করবেন? বড় আজিব কথা!

মূলত হজরত উবাই ইবনে কাব রা. তাঁর সংকলিত কুরআনে মানসুখের সব আয়াতগুলোও রেখেছেন। যা বর্তমানে কুরআনে (কয়েকটি ছাড়া) নেই। আর এটাকেই এই মিথ্যুক দ্বন্দ্ব হিসেবে আবিষ্কার করেছে![২৭]

---

[২৬] *ইবনে কাসির*: পৃষ্ঠা নম্বর ১৩৪ খণ্ড নম্বর ১৫।
[২৭] *বুখারি শরিফ*: ৪১২৯- ৪৬৩৯।

আঠারো :

'কোরান নবি মুহাম্মদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ আমরা দেখি, নবি মুহাম্মদ স্বয়ং কয়েকটি আয়াত ভুলে গেছেন। পরবর্তীতে জনৈক সাহাবির আবৃত্তি শুনে সেটি তার মনে পড়ে যায়। *সহিহ বুখারি ৪৬৬৭-৬৮, ৪৬৭৩ ও ৫৮৯৬ নম্বর হাদিস। সহিহ মুসলিম ১৭১০-১১ ও ৩৯২৯ নম্বর হাদিস।*'

উত্তর :

ভুল দুই ধরনের হয়।

এক. পূর্বে এমন একটি কথা বলা যে, পরবর্তীতে তা একেবারেই ভুলে যাওয়া। এমনকি কেউ তা স্মরণ করিয়ে দিলেও তা আর স্মরণ হয় না; বরং উল্টো সংশয় হয় যে, সত্যিই কি তা পূর্বে বলা হয়েছিল।

দুই. পূর্বে এমন একটি কথা বলা যে, পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কিছু সময়ের জন্য তা স্মৃতিপট থেকে দূর হয়ে যায়, কিন্তু কোনো কারণে তা আবার মনেও পড়ে যায়। আর এটাকে ভুল বলে না।

প্রথমত : উক্ত ঘটনাটি এ রকমই, অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকারের। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সাহাবিকে আলাদাভাবে কিছু আয়াত শিখিয়েছিলেন এবং তখন সে আয়াতগুলোর ব্যাপক চর্চা হতো না। আর চর্চা না হওয়ার কারণে সে আয়াতগুলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্মৃতিপট থেকে সাময়িকভাবে চলে যায়, কিন্তু উক্ত সাহাবির তেলাওয়াত শোনার সাথে সাথেই তা আবার মনে পড়ে যায়। যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে আয়াতগুলো একদম ভুলেই যেতেন, তাহলে উক্ত সাহাবির তেলাওয়াত শোনার সাথে সাথে তা কী করে আবার স্মরণ হলো?

দ্বিতীয়ত : উক্ত আয়াতগুলোর ব্যাপকতর চর্চা হতো না। আর এতেই বোঝা যায় যে, সে আয়াতগুলো সবার জন্য ছিল না; বরং নির্দিষ্ট সাহাবির জন্যই ছিল। কেননা, উক্ত আয়াতগুলো যদি সবার জন্য হতো তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য সাহাবিগণকেও তা শেখাতেন এবং সে আয়াতগুলোর ব্যাপক চর্চা হতো।[২৮]

---

[২৮] *বুখারি শরিফ*: পৃষ্ঠা নম্বর ৭৫৩ খণ্ড নম্বর ২। *মুসলিম শরিফ*: পৃষ্ঠা নম্বর ২৬৭ খণ্ড নম্বর ০১। *উলুমুল কুরআন*: পৃষ্ঠা নম্বর ২১৪-২১৬

কোরানের যত কন্ট্রাডিকশন...

'নাস্তিকরা কুরআনুল কারিমের ওপর যেসব আপত্তি তুলছে, তা নতুন কোনো বিষয় নয়; বরং অতীতেও তাদের পূর্বসূরিরা এমন আপত্তি তুলেছিল। বর্তমান যুগের নাস্তিকরা শুধু ভাষা ও শব্দ পরিবর্তন করে নতুন শব্দ এবং নতুন ভাষায় সেই একই বিষয়ের অবতারণা করছে। ইসলামি স্কলারগণ অতীত হতে আজ পর্যন্ত সেসব অবান্তর আপত্তির জবাব দিয়েছেন সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে। এবং এ সম্পর্কিত আমাদের পূর্বসূরি স্কলারগণের এত পরিপূর্ণ লেখনী রয়েছে যে, বর্তমান যুগে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জবাব দেওয়ার জন্য তাতে (লেখনীতে) কোনো ধরনেরই সম্পাদনার প্রয়োজন মনে করি না।'[২৯]

---

[২৯] আল্লামা শাহ আহমদ শফী দা.বা., *আল-খাইরুল কাসির*: ১০ নম্বর পৃষ্ঠা।

কোরানের যত কন্ট্রাডিকশন...[৩০]

নাস্তিকের ধর্মকথা

ভূমিকা :

'এই পোস্ট আসলে সামু ব্লগে সাহোশি৬-এর পরামর্শে ও অনুরোধে লেখা। তবে আমি মনে করি, কোরআনের মতো একটি বিশাল সাইজের গ্রন্থের যাবতীয় কন্ট্রাডিকশন আমার একার পক্ষে একটি পোস্টে নিয়ে আসাটা প্রায় অসম্ভব। তাই আমি কাজটি শুরু করে দিচ্ছি। আশা করব, সকলে মিলে এই কাজটিকে এগিয়ে নেবেন।'

কন্ট্রাডিকশন : ১

কোনো এক আয়াতের সাথে আরেক আয়াতের বৈপরীত্য।

সুরা ৪১ : ৯, ১০, ১১, ১২ : 'বলুন, তোমরা কি সে সত্তাকে অস্বীকার করো, যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুদিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থির করো? তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা।

তিনি পৃথিবীতে উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন; পূর্ণ হলো জিজ্ঞাসুদের জন্যে।

অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন, যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ, অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, "তোমরা উভয়ে আসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।" তারা বলল, "আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম।"

অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দুদিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী

---

[৩০] কন্ট্রাডিকশন পোস্টের লিংক : https://www.nastikya.com/archives/939

আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।'

=> এই আয়াতসমূহ অনুযায়ী দেখা যায়, দুদিনে আকাশ সৃষ্টির আগে পৃথিবী ও পৃথিবীর যাবতীয় কিছু সৃষ্টি হয়েছে চার দিনে।

সুরা ৭৯ : ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ : 'তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন? তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন। তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাস নির্গত করেছেন, পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে।'

=> **'এখানে আবার দেখা যায়, আকাশ সৃষ্টির পরে পৃথিবীকে বিস্তৃত করা হয়েছে ও পর্বতাদি সৃষ্টি করা হয়েছে।'**

উত্তর :

কন্ট্রাডিকশন মানে হলো, স্ববিরোধী, অসংগতি ইত্যাদি। এখানে এই বেচারা (নাস্তিকের ধর্মকথা) কয়েকটি জায়গায় কুরআনের এক আয়াতকে অন্য আয়াতের বিপরীত দাঁড় করিয়ে কুরআনকে স্ববিরোধীগ্রন্থ হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছে। একইভাবে অন্যান্য জায়গায় কুরআনের আয়াতকে বিজ্ঞান, বর্তমান প্রেক্ষাপটসহ ইত্যাদির বিপরীত দাঁড় করিয়ে ভুলগ্রন্থ হিসেবে সাব্যস্ত করতে চেয়েছে। তো দেখা যাক, তার দৌড় কতটুকু।

এখানে কুরআনের স্ববিরোধিতা দেখানোর জন্য সে দুটি সুরার পৃথক দুটি আয়াত এনেছে।

সুরা হা-মিম সাজদার আয়াতে দেখা যায় যে, আল্লাহ তাআলা পৃথিবী ও তার যাবতীয় কিছু চার দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং এরপর আকাশকে দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন। আবার সুরা নাজিআতের আয়াতে দেখা যায় যে, আল্লাহ তাআলা প্রথমে আকাশ এবং এরপর পৃথিবী ও পর্বতাদি সৃষ্টি করেছেন। যাদের মধ্যে কুরআন বোঝার যোগ্যতা নেই এবং শুধু বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ পড়েই কুরআনের ব্যাখ্যায় লেগে যায়, সেসব মূর্খ কুরআনে-কুরআনে স্ববিরোধিতাই পাবে। আসলে অসংগতি কুরআনে নয়; বরং তাদের মস্তিষ্কে।

পৃথিবী সৃষ্টির কাজ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম দুই দিন আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর ভিত্তি এবং উপরিভাগের পর্বতগুলোকে সৃষ্টি করেন। এরপরের দুই দিনে আকাশ সৃষ্টি করেন। অতঃপর পরবর্তী দুই দিনে পৃথিবীকে বিস্তৃত করে তার মধ্যবর্তী পর্বতমালাসহ অন্যান্য কাজ; অর্থাৎ গাছ-গাছালি, নদী, ঝর্ণা ইত্যাদির কাজ সম্পূর্ণ করেন।

যেমন উদাহরণস্বরূপ : মানুষ বহুতল বিল্ডিংয়ের কাজ করার সময় প্রথমে ভিত্তির কাজ করে, এরপর ছাদের কাজ করে। অতঃপর বিল্ডিংয়ের মধ্যবর্তী কাজ; অর্থাৎ দেয়ালসহ অন্যান্য যাবতীয় কাজ করে। এভাবেই আল্লাহ তাআলা পৃথিবী সৃষ্টির কাজ করেছেন।

উক্ত দুই আয়াতে আল্লাহ তাআলা সে কথাই বলেছেন। সুরা হা-মিম সাজদার আয়াতে প্রথমে পৃথিবীর ভিত্তি ও পিলাররূপে উপরিভাগের পর্বতমালা সৃষ্টির পর ছাদ—অর্থাৎ আকাশ—সৃষ্টির কথা বলেছেন। আর সুরা নাজিআতের আয়াতে পরবর্তী কাজ—অর্থাৎ আকাশ সৃষ্টির পর পৃথিবীকে বিস্তৃতকরণসহ তার মধ্যবর্তী পর্বতমালা সৃষ্টি—এর কথা বলেছেন। এক আয়াতে পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম ধাপ ও দ্বিতীয় ধাপের কাজের কথা বলেছেন এবং অন্য আয়াতে দ্বিতীয় ধাপসহ তৃতীয় ধাপ; অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্মের ফিনিশিংয়ের বিবরণ দিয়েছেন।[৩১]

তো এখানে স্ববিরোধিতা কোথায়? মূর্খদের অভ্যাসই হলো, নিজের মূর্খতার জন্য নিজেকে জ্ঞানী ভেবে অন্যকে দোষারোপ করা।

কন্ট্রাডিকশন : ২

'কোনো এক আয়াতের নির্দেশনা, উপদেশ... প্রভৃতির প্রতিফলন কোরআনের অন্যত্র না মেলা।

সুরা ১০৯ : ৬ : 'লাকুম দিনুকুম ওয়ালিইয়াদিন; যার যার ধর্ম তার তার কাছে'-এর সাথে সুরা ২ : ১৯১ : 'আর তাদের হত্যা করো যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদের বের করে দাও সেখান থেকে, যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করেছিল। বস্তুত: ফেতনা-ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই

---

[৩১] *বয়ানুল কুরআন* : আল্লামা থানবি রাহি., পৃষ্ঠা নম্বর ৩২৫-৩২৬ খণ্ড নম্বর ০৩, প্রকাশনা: ফরিদ বুক ডিপো, নিউ দিল্লি।

তোমাদের সাথে লড়াই করে তাহলে তাদের হত্যা করো। এই হলো কাফেরদের শাস্তি।' এবং এমন অসংখ্যা আয়াত।

উত্তর :

এখানে কন্ট্রাডিকশন হিসেবে তার কৃত অনুবাদে সুরা কাফিরুনের আয়াতে দেখা যাচ্ছে যে, সবাইকে নিজ নিজ ধর্ম পালনের ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আর সুরা বারাকার আয়াতে দেখা যাচ্ছে যে, বিধর্মীদের সেই ধর্ম পালনের স্বাধীনতাকে খর্ব করে তাদের হত্যার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

সুরা বাকারার ১৯১ নম্বর আয়াতটি অবতীর্ণ হয় হুদাইবিয়ার ঘটনার[৩২] পরবর্তী বছর। হুদাইবিয়া সন্ধির পরবর্তী বছর যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিগণকে নিয়ে পূর্ববর্তী বছরের কাজা ওমরাহ আদায় করার নিয়ত করলেন, তখন সাহাবিগণের সন্দেহ হলো যে, এ বছরও হয়তো মক্কার মুশরিকরা পূর্ববর্তী বছরের মতো বাধা প্রদান করবে। আর যদি মুশরিকরা বাধা প্রদান করে তাহলে মুসলমানদের করণীয় কী হবে? তখন আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে মুসলমানদের তাদের করণীয় ঠিক করে দেন। অর্থাৎ যদি তারা (মুশরিকরা) তোমাদের বাধা দেয়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যেখানে পাবে, সেখানেই তাদের হত্যা করবে।[৩৩]

প্রথমত : সে এখানে নিজের কথার সমর্থনের জন্য সুরা কাফিরুনের আয়াত—'লাকুম দিনুকুম ওয়ালিইয়াদিন' এর অনুবাদ করেছে, 'যার যার ধর্ম তার তার কাছে।'

অথচ সুরা কাফিরুনের আয়াতের যথাযথ অনুবাদ হলো, 'তোমাদের দীন তোমাদের জন্য এবং আমাদের দীন আমাদের জন্য।' অর্থাৎ কুফর ও ইমান সম্পূর্ণ আলাদা দুটি জিনিস। তার মধ্যে এ রকম কোনো মীমাংসা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, যা দ্বারা সত্য-মিথ্যার প্রভেদ ঘুচে যাবে এবং সত্য দীনের সাথে কুফর ও শিরকের মিশ্রণ ঘটে যাবে। হাঁ, তোমরা যদি সত্য কবুল করতে প্রস্তুত না হও, তবে ঠিক আছে, নিজেদের ভ্রান্ত ধর্মানুসারে কাজ করতে থাকো। যার পরিণাম একদিন তোমাদের ভোগ করতে হবে। আর আমিও আমার নিজ দীনের অনুসরণ করে যাব, যার দায়-দায়িত্ব আমার নিজের। উল্লেখ্য, এর দ্বারা এও বোঝা গেল যে,

---

[৩২] হুদাইবিয়ার ঘটনাটি ৮০ পৃষ্ঠায় দেখুন।

[৩৩] *তাফসিরে কুরতুবি*, উক্ত আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য। *তাফসিরে মাআরেফুল কুরআন*, উক্ত আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।

অমুসলিমদের সঙ্গে এমন কোনো চুক্তি জায়িয নয়, যার ফলে তাদের ধর্মীয় কোনো রীতি-রেওয়াজ গ্রহণ করতে হয়। হাঁ, নিজ দীনের ওপর পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত থেকে তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি হতে পারে, যেমন সুরা আনফালে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (৮ : ৬১)।[৩৪]

দ্বিতীয়ত : সে এমনভাবে একই সাথে উক্ত দুই আয়াত নিয়ে এসেছে যে, মনে হয়, উক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপটও অভিন্ন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, উক্ত আয়াতগুলোর অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সুরা কাফিরুন অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট হলো : মক্কার কুরাইশরা প্রথমে ভেবেছিল, তারা যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করে, মুসলমানরাও সেসব উপাস্যদের উপাসনা করে। এই ভেবে কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন সর্দার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, 'মুহাম্মাদ! আসুন আমরা এই মর্মে সন্ধি করে নিই যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের উপাসনা করবেন এবং পরবর্তী বছর আমরা আপনার উপাস্যের উপাসনা করব। আর এরূপে আমরা উভয় পক্ষই অপর পক্ষের ধর্মের কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করে নেব।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আমি আল্লাহর সাথে এক মুহূর্তের জন্যেও কাউকে শরিক করতে পারব না।' তখন আল্লাহ তাআলা সুরা কাফিরুন অবতীর্ণ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, 'হে নবি! আপনি বলুন, আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যে সকল উপাস্যদের উপাসনা করো, আমি বর্তমানেও ওদের উপাসনা করি না, ভবিষ্যতেও কখনো করব না। আর তোমরাও আমাদের একক উপাস্য আল্লাহর উপাসনা করো না।'

অর্থাৎ তোমরা যেসব ভ্রান্ত উপাস্যদের উপাসনা করো, সেসব ভ্রান্ত উপাস্য এবং আমাদের সত্য উপাস্য আল্লাহ তাআলা একই নন। তাই তোমরা মুশরিক হয়েও একেশ্বরবাদী হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারো না। আল্লাহ তাআলা আমাদের যে পরিপূর্ণ ধর্ম দিয়েছেন, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট আছি। আর আমরা তোমাদের মিথ্যা উপাস্যদের ভ্রান্তি বোঝানোর পরও তোমরা নিজেরা দুর্ভাগ্যবশত যে গতিধারা অবলম্বন করে আছ, তা নিয়েই থাকো। প্রত্যেক দলকেই নিজ নিজ গতিপথের জন্য ফলভোগ করতে হবে।

---

[৩৪] *তাফসিরে তাওযিহুল কুরআন*, উক্ত আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।

সুরা কাফিরুনে আল্লাহ তাআলা সবাইকে নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেননি; কাফিরদের অমূলক দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন মাত্র। মুসলিম এবং বিধর্মীদের মধ্যে উপাসনাগত পার্থক্য দেখিয়েছেন। এবং সর্বশেষ এটা বলে সর্তকও করে দিয়েছেন যে, বিধর্মীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে অন্য যে সকল ধর্ম অনুসরণ করছে, এর জন্য অবশ্যই তাদের ফলভোগ করতে হবে। তাই সুরা কাফিরুন এবং সুরা বাকারার আয়াতকে একসাথে মিলিয়ে এক আয়াতের নির্দেশনা, উপদেশ... প্রভৃতির প্রতিফলন অন্য আয়াতে খোঁজা মূর্খতা ছাড়া আর কী?[৩৫]

কন্ট্রাডিকশন : ৩

'ভাষা/ব্যকরণগত ভুল'

১। সুরা ৫ : ৬৯ : "নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদি, ছাবেয়ি বা খ্রিষ্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।"

'এটা বুঝতে হলে—সুরা ৫ : ৬৯, সুরা ২ : ৬৭ এবং ২২ : ১৭-এর প্রথম লাইন পাশাপাশি দেখা দরকার—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللهِ* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ

৫ : ৬৯-এর الصَّابِؤُونَ আসলে Nominative case এবং ২ : ৬৭ ও ২২ : ১৭-এর الصَّابِئِي হচ্ছে Accusative case (উদাহরণ : Whom, him, her, me, them, us are the accusative forms of who, he, she, I, they, and we respectively)। যারা ইহুদি, ছাবেয়ি, খ্রিষ্টান। এখানে যারা বা who (إِنَّ) হচ্ছে Nominative case, এর পরে বসবে Accusative case, অর্থাৎ

---

[৩৫] *আসবাবুন নুজুল*, জালালুদ্দিন সুয়ুতি : পৃষ্ঠা নম্বর ১৯৬, প্রকাশনা: মাকতাবায়ে ইসলামিয়া, ঢাকা। *আশরাফুত তাফাসির* : খণ্ড নম্বর ০৪, পৃষ্ঠা নম্বর ৪০৭-৪০৮ প্রকাশনা: ইদারায়ে তালিফাত, মুলতান। *তাফসিরে উসমানি*, সুরা ইখলাসের তাফসির দ্রষ্টব্য।

সাবেঈন বসবে (যা সুরা ২:৬৭ ও ২২:৬৭ এ বসেছে), Nominative case অর্থাৎ সাবেঊন (যা ৫:৬৯ এ বসেছে) বসালে সেটা হবে ব্যাকরণগত ভুল।

উত্তর :

আরবি ব্যাকরণসমৃদ্ধ সর্বোচ্চ গ্রন্থ হলো কুরআনুল কারিম, আর সে গ্রন্থেই ব্যাকরণগত ভুল! আজিব বাত তো!

আরবি ব্যাকরণবিদগণের নেতা সিবওয়াই রহ.-সহ অন্যান্য ব্যাকরণবিদগণ যখন সুরা মায়েদার ৬৯ নম্বর আয়াতকে ব্যাকরণগত দিক দিয়ে কয়েকভাবে শুদ্ধরূপে দেখিয়েছেন, সেখানে বাঙলাভাষী এই নাস্তিক কীভাবে তা ভুল বলে! চোখ থাকতে এরা এত অন্ধ হয় কীভাবে?

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

উক্ত আয়াতে 'আস-সাবিউন' হলো মুবতাদা (Subject) আর তার খবর (Predicate) হলো উহ্য (Hidden)। এবং উক্ত আয়াতে উহ্য ইবারত এ রকম—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالصَّابِئُونَ كذلك

কিন্তু মূলে 'আস-সাবিউন' আগে এসেছে সতর্কীকরণ হিসেবে। কেননা, বিশ্বাসগত (আকিদা) দিক থেকে 'সাবিউনরা' ছিল ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের চেয়েও জঘন্য। তাই তাদের সে আকিদার প্রতি সতর্ক করার উদ্দেশ্যে 'সাবিউন'কে আল্লাহ তাআলা প্রথমদিকে উল্লেখ করেছেন।[৩৬]

কন্ট্রাডিকশন : ৪

'বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা ভুল প্রমাণিত। (এটার ভুরি ভুরি নজির আছে)'

---

[৩৬] *ইরাবুল কুরআন*, সুরা মায়িদার ৬৯ নম্বর আয়াতের তারকিব দ্রষ্টব্য। *আল-ইতকান*, খণ্ড নম্বর ০২, পৃষ্ঠা নম্বর ৫৭৪, দারুল হাদিস, কায়রো।

১। সুরা ৫১ : ৪৯ : 'আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম করো।'

=> 'ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, অ্যামিবা সব কিছু কি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয়েছে?'

উত্তর :

বিজ্ঞান দিয়ে কুরআনকে মাপা! মানুষ এ রকম ভুল কেন করে আমার বুঝে আসে না। বিজ্ঞান তো একটি অসম্পূর্ণ ও অরক্ষিত বিষয়।

একটি অরক্ষিত এবং অসম্পূর্ণ বিষয় কীভাবে মাপকাঠি হয়? বিজ্ঞান তো মুহূর্তে রূপ পাল্টায়। এক বিজ্ঞানী দশ বছর আগে যা সত্য প্রমাণিত করে যায়, দশ বছর পর অন্য বিজ্ঞানী তা ভুল প্রমাণিত করে। আর এই বিজ্ঞানই কীভাবে কুরআনের মাপকাঠি হয়?

মাপকাঠি হবে তো কুরআন। কুরআন রক্ষিত এবং সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ। ১৪০০ বছর আগে কুরআন যা বলেছে আজও তা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। যেমন : ১৪০০ বছর আগে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, 'আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম করো।'

উক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'জোড়া' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ বস্তুর জোড় পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গের মিশেলে যেমন হতে পারে, তেমন বস্তুর বিপরীত বস্তুর মিশেলেও জোড়া হতে পারে; চাই তা লিঙ্গধর হোক বা লিঙ্গবিহীন হোক।

বস্তুর জোড়া সম্পর্কে বিজ্ঞান একই কথা বলে। ১৯২৪ সালে ফ্রান্সের পদার্থ বিজ্ঞানী Prince Louis de Broglie একটি অসাধারণ থিউরি দিলেন বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে।

প্রিন্স লুইসের মতে, প্রকৃতি প্রতিসাম্যতা ভালোবাসে। আলো প্রকৃতিতে দ্বৈতবাদী, কোনো কোনো সময়ে সে তরঙ্গের মতো আচরণ করে এবং অন্য সময় কণার মতো আচরণ করে। যদি প্রকৃতি প্রতিসাম্য হয়ে থাকে, তাহলে এই দ্বৈত আচরণ বস্তুও করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বস্তুর একটা কণার মতো রূপ আছে এবং Symmetric তরঙ্গিয় রূপও আছে। অর্থাৎ প্রতিটি বস্তু তরঙ্গ ও কণা রূপে জোড়ায় জোড়ায় আছে।

উল্লেখ্য, প্রিন্স লুইস ১৯২৯ সালে উক্ত আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন।[৩৭]

কন্ট্রাডিকশন : ৪ (ক)

২। সুরা আল-কাহফ : ৮৬ : 'পরে যখন তিনি সূর্য অস্ত যাবার স্থানে পৌঁছলেন, তিনি এটিকে দেখতে পেলেন কালো জলাশয়ে অস্তগমন করছে, আর তার কাছে পেলেন এক অধিবাসী। আমরা বললাম, হে জুলকারনাইন, তোমরা শাস্তি দিতে পারো অথবা এদের সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারো।'

আয়াত ৯০ : 'পরে যখন তিনি সূর্য উদয় হওয়ার জায়গায় পৌঁছলেন তখন তিনি এটিকে দেখতে পেলেন, উদয় হচ্ছে এক অধিবাসীর ওপরে, যাদের জন্য আমরা এর থেকে কোন আবরণ বানাইনি।'

=> 'সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের স্থান নাকি যথাক্রমে সর্ব পশ্চিম ও সর্ব পূর্বে!'

উত্তর :

কুরআনুল কারিমের উক্ত আয়াতগুলোতে বাদশাহ জুলকারনাইনের অনুভূতিসহ তাঁর ভ্রমণ কাহিনী সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

জুলকারনাইন পৃথিবীর প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। পশ্চিমে গিয়ে তিনি সূর্যকে একটি জলাশয়/সাগরে অস্তগমন করতে দেখলেন। তাই কুরআন জুলকারনাইনের দেখা অনুভূতিকে সেভাবে তুলে ধরেছে। কুরআন এটা বলেনি যে, সূর্য উদয় ও অস্তগমন করে; বরং জুলকারনাইন স্বচক্ষে দেখে যা অনুভব করেছিলেন, তা এভাবে বর্ণনা করেছে, 'তিনি এটিকে দেখতে পেলেন কালো জলাশয়ে অস্তগমন করছে।'

প্রথমত : উভয় আয়াতে 'তিনি দেখতে পেলেন' বাক্যটি দ্বারাই তো সহজে বোঝা যায় যে, এখানে জুলকারনাইনের অনুভূতির কথা তুলে ধরা হয়েছে।
দ্বিতীয়ত : মানবীয় অনুভূতিকে কুরআনে সেভাবেই তুলে ধরা হয়েছে, যেভাবে মানুষজন সহজে বুঝতে পারে।

---

[৩৭] "Nature loves symmetry. Light is dualistic in nature, behaving in some situations like waves and in others like particle. If nature is symmetric, this duality should also hold for matters!". (Young, Freedman 2014, p 1416).
http://rense.com/ufo/antimat.htm

যেমন : সাগরের পারে দাঁড়ানো বা সাগরে ভ্রমণকারী ব্যাক্তির নিকট যেভাবে মনে হয় যে, সূর্য সত্যিই সাগরে ডুবে যাচ্ছে, সেভাবে জুলকারনাইনের নিকটও মনে হয়েছিল, সূর্য সাগরে অস্তগমন করছে। আর এ জন্যই কুরআন জুলকারনাইনের অনুভূতিকে সেভাবে তুলে ধরেছে।[৩৮]

কন্ট্রাডিকশন : ৪ (খ)

৩। সুরা ইয়াসিন : ৩৮ : 'আর সূর্য তার গন্তব্য পথে (resting place) বিচরণ করে। এটিই মহাশক্তিশালী সর্বাজ্ঞ সত্তার বিধান।'

৩৯ : 'আর চন্দ্রের বেলা, আমরা এর জন্য বিধান করেছি বিভিন্ন অবস্থান, শেষ পর্যন্ত তা পুরোনো শুকনো খেজুরবৃন্তের মতো হয়ে যাবে।'

৪০ : 'সূর্যের নিজের সাধ্য নেই চন্দ্রকে ধরার, রাতেরও নেই দিনকে অতিক্রম করার। আর সবকটিই কক্ষপথে ভাসছে।'

উত্তর :

উক্ত আয়াতগুলোতে তো কুরআনের বৈজ্ঞানিকতাই প্রমাণিত হয়। সুরা ইয়াসিনের ৩৮ নম্বর আয়াতে কুরআন সেই কতকাল আগে বলে দিয়েছে যে, সূর্য তার কক্ষপথকে কেন্দ্র করে ঘোরে। আর সে কথা বিজ্ঞান এই তো মাত্র ১৯০৪ সালে এসে আবিষ্কার করেছে।

মূলত আমাদের পুরো সৌরজগত একটি গ্যালাক্সির মধ্যে রয়েছে। এই গ্যালাক্সিটার নাম হলো মিল্কিওয়ে। এর একটি কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে, যা আমাদের এই সৌরজগত থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে। সূর্য ঠিক সেই কেন্দ্রবিন্দুকে কেন্দ্র করে পুরো সৌরজগত সমেত ঘুরে আসছে। আর এভাবে এক বার ঘুরে আসতে সূর্যের সময় লাগে প্রায় ২৫ কোটি বছর। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা সে কথাই বলেছেন এবং শেষে এটাও বলে দিয়েছেন, সূর্যের এই ভ্রমণ চিরস্থায়ী নয়; বরং একদিন তা শেষ হবে এবং সে সময় হবে কিয়ামতের সময়।[৩৯]

---

[৩৮] *তাফসিরে উসমানি*, উক্ত আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।

[৩৯] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Milky_Way

৩৯ নম্বর আয়াতে চাঁদের বিভিন্ন অবস্থান বিধানের কথা বলা হয়েছে। তো এখানে এই আয়াতটা নিয়ে আসার মানে কী? এই সহজ আয়াতগুলো যারা বোঝে না, সেসব মূর্খই আবার কুরআনের কন্ট্রাডিকশন খোঁজে!

উক্ত আয়াতে চাঁদের অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে তার (চাঁদের) ঘূর্ণন ও অবস্থান অনুযায়ী সূর্যের আলো তার ওপর কম-বেশ পড়ায় কখনো তাকে বড় দেখায় আর কখনো ছোট। আর চাঁদের এই ছোট-বড় দেখানোর সিস্টেমটা আল্লাহ তাআলা পৃথিবীবাসীর জন্য করে রেখেছেন, যাতে করে পৃথিবীর মানুষ দিন, মাস ও বছরের হিসাব রাখতে পারে।

যারা বুঝেননি, তাদের জন্য আরেকটু সহজ করে বলি।

মূলত চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্যের আলো দ্বারাই চাঁদ আলোকিত হয়। সূর্যের আলো কখনো সরাসরি চাঁদের ওপর পড়ে আর কখনো পাশ থেকে পড়ে।

আর এ কারণে পৃথিবী থেকে চাঁদকে কখনো বড় দেখায় আর কখনো এমন ছোট দেখায় যে, মনে হয় একটি শুকনো খেজুরগাছের ডাল। চাঁদের এই অবস্থানটা আল্লাহ তাআলাই নির্ধারণ করেছেন পৃথিবীবাসীর জন্য; যাতে করে পৃথিবীর মানুষ তাদের দিন, মাস ও বছরের হিসাব রাখতে পারে।[৪০]

৪০ নম্বর আয়াতে সূর্য এবং চাঁদের রাজত্বসীমা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে দেশে যে ঋতুতে রাতদিনের যে পরিমাণ নির্ধারিত, তাতে এই চাঁদ-সূর্যের পক্ষে নিজ থেকে এক মিনিট এদিক-সেদিক করার সাধ্য নেই। এবং তারা উভয়ে বিদ্যুৎ গতি ও বিশাল অবয়ব হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে সংঘর্ষ বাধে না। একে অন্যের সীমায় কখনো প্রবেশ করে না।

কন্ট্রাডিকশন : ৪ (গ)

৪। সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৩১ : 'আর পৃথিবীতে আমরা পাহাড় পর্বত স্থাপন করেছি, পাছে তাদের সঙ্গে এটি আন্দোলিত হয়; আর ওতে আমরা বানিয়েছি চওড়া পথঘাট, যেন তারা সৎপথপ্রাপ্ত হয়।'

আয়াত ৩২ : 'আর আমরা আকাশকে করেছি এক সুরক্ষিত ছাদ। কিন্তু তারা এর নিদর্শনাবলী থেকে বিমুখ থাকে।'

---

[৪০] *তাফসিরে তাবারি*, মুহাম্মাদ ইবনে জারির তাবারি, উক্ত আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।

উত্তর :

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীবাসীর নিরাপত্তার জন্য আকাশকে পরিপক্ক, দৃঢ় এবং প্রশস্তরূপে একটি সুরক্ষিত ছাদ বানিয়েছেন। আর এ কথাটি বিজ্ঞানও স্বীকার করে।

বিজ্ঞান বলে, সূর্যে প্রতি সেকেন্ডে ৬২ কোটি মেট্রিক টন হাইড্রোজনের বিস্ফোরণ হয়। যদি এসব বিস্ফোরণের সামান্য একটু আঁচও পৃথিবীতে লাগত, তাহলে পুরো পৃথিবী পুড়ে ছাইয়ের মতো হয়ে যেত। আর পৃথিবীকে এ রকম বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে বায়ুমণ্ডলের ওজনস্তর। ঠিক তেমনিভাবে মহাকাশে সেকেন্ডে সেকেন্ডে যেসব তেজস্ক্রিয় উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়, সেগুলো থেকেও পৃথিবীকে এই ওজনস্তর রক্ষা করে। আর এই ওজনস্তরটি হলো বায়ুমণ্ডল যেসব পুরু স্তর দ্বারা গঠিত সেসব স্তরগুলোর একটির—অর্থাৎ ট্রাটোস্ফিয়ার—উপস্তর। আবার এই বায়ুমণ্ডলের চারপাশ ঘিরে রেখেছে একটি বেল্ট, যা পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের চারদিকে যে শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, তারই অংশ।

বিজ্ঞান বলে এই বায়ুমণ্ডলের পুরোটাই পৃথিবীর ছাদরূপে কাজ করে এবং পৃথিবীকে এ রকম বিপদ থেকে রক্ষা করে। কুরআন শত শত বর্ষ পূর্বে যা বলেছে, বিজ্ঞান তা এই সেদিন আবিষ্কার করেছে।[৪১]

কন্ট্রাডিকশন : ৪ (ঘ)

৫। সুরা আল হিজর : আয়াত ১৯ : 'আর পৃথিবী, আমরা তাকে প্রসারিত করেছি, আর তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা, আর তাতে উৎপন্ন করেছি হরেক রকমের জিনিস সুপরিমিতভাবে।'

৬। সুরা আন নাবা : আয়াত ৬-৭ : 'আমরা কি পৃথিবীটাকে পাতানো বিছানোরূপে বানাইনি? আর পাহাড়-পর্বতকে খুঁটিরূপে?'

৭। সুরা আল বাকারাহ : আয়াত ২২ : 'যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে ফরাশ (couch) বানিয়েছেন, আর আকাশকে চাঁদোয়া (canopy)।'

৮। সুরা লুকমান : আয়াত ১০ : 'তিনি মহাকাশমণ্ডলীকে সৃষ্টি করেছেন কোনো খুঁটি ছাড়াই, তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ; আর তিনি

---

[৪১] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Frank_Press.

পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, পাছে এটি তোমাদের নিয়ে ঢলে পড়ে...।'

=> 'সূর্য কিন্তু রাতের সময় বিশ্রাম নিতে যায়! সূর্য ও চাঁদ উভয়েই কক্ষপথে গতিশীল, কিন্তু পৃথিবী এতটুকু যাতে নড়চড় করতে না পারে, তার জন্য পেরেকরূপী পাহাড়-পর্বত।'

উত্তর :

সুরা হিজরের ১৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলার একটি আশ্চর্যজনক শক্তিমত্তার কথা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তাতে উৎপন্ন করেছি হরেক রকমের জিনিস সুপরিমিতভাবে।' অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে উৎপন্ন প্রতিটি বস্তুকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাপে উৎপাদন করেন। মানুষ এবং জীবজন্তুর প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের খাবার উৎপাদন করেন। বেশিও নয়, আবার কমও নয়। যদি এই পরিমাপটা তিনি নির্দিষ্ট না করতেন, তাহলে পৃথিবীর অবস্থা খারাপ হয়ে যেত। খাবার উৎপাদনের পরিমাণ বেশি হলে তা পচে পৃথিবী দুর্গন্ধময় হয়ে যেত। আর উৎপাদন যদি কম পরিমাণে হতো তাহলে খাদ্য সংকটে একসময় পৃথিবীবাসীর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেত। সুরা হিজরের এই আয়াতগুলো পড়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়।

আফসোস, অবিশ্বাসীরা যদি একটিবার চিন্তা করত!

চাঁদ-সূর্যের আলোচনা ওপরে গেছে। এখানে পৃথিবী বিছানারূপে হওয়া এবং পাহাড় তার জন্য পেরেকরূপে হওয়ার আলোচনা করব। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে—অর্থাৎ পৃথিবীর জমিনকে—আমাদের জন্য বিছানারূপে বিনীত ও মোলায়েম বানিয়েছেন। জমিনকে পাথরের মতো শক্ত বানাননি এবং পানির মতো তরলও বানাননি। যদি তিনি জমিনকে তরল বা পাথরের মতো শক্ত বানাতেন তাহলে পৃথিবীতে মানুষ ও জীবজন্তুর বসবাস মুশকিল হয়ে যেত। মানুষের চাষাবাদ করতে কষ্ট হত। তা না করে তিনি জমিনকে আমাদের অনুগত বানিয়েছেন।

আমরা নিজেদের ইচ্ছেমতো জমিনকে ব্যবহার করতে পারি। এবং এভাবে আমাদের ভারসাম্য টিকিয়ে রাখার জন্য পাহাড়-পর্বতকে পেরেকরূপে জমিনে গেড়ে দিয়েছেন।

আর বিজ্ঞান সে কথাই বলে। ভূ-তত্ত্ববিদগণের মতে : পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৭৯৫০ মাইল এবং ভূপৃষ্ঠের শক্ত যে উপরিভাগে আমরা বাস করি, তা অত্যন্ত পাতলা-মোলায়েম। এর বিস্তার ১ মাইল থেকে ৩০ মাইল পর্যন্ত। যেহেতু ওপরের এই

আবরণটি পাতলা, তাই এর আন্দোলিত হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। কিন্তু পৃথিবীর পাহাড়গুলো খুঁটি কিংবা তাঁবুর পেরেকের মতো ভূপৃষ্ঠকে ধারণ করে এবং একে স্থিতি দান করে।

ড. ফ্রাঙ্ক প্রেস—যিনি ১২ বছর ধরে অ্যামেরিকার বিজ্ঞান একাডেমীর প্রেসিডেন্ট এবং প্রাক্তন অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন—তার লিখিত বই *Earth*-এ তা এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : পাহাড়-পর্বত হচ্ছে পেরেকাকৃতিবিশিষ্ট এবং এগুলো অবিভক্ত বস্তুর এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র, যার মূল মাটির গভীরে প্রোথিত। ভূপৃষ্ঠের আবরণকে স্থিতিশীল রাখতে পাহাড়-পর্বতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাহাড় পর্বত যে পেরেকস্বরূপ, তা ভূ-তত্ত্ববিদগণের শত শত বছর আগে কুরআন বলে দিয়েছে। এবং ভূপৃষ্ঠের যে উপরিভাগে আমরা বাস করি তার আবরণও যে খুব পাতলা-মোলায়েম তাও শত শত বছর আগে কুরআন বলে দিয়েছে। বিজ্ঞান বললেই অলৌকিক হয়ে যায় আর কুরআন বিজ্ঞানের শত শত বছর আগে বললেও লৌকিক গ্রন্থ![৪২]

কন্ট্রাডিকশন : ৪ (ঙ)

৯। সুরা ২৩ : ১৩, ১৪ : 'তারপর আমরা তাকে বানাই শুক্রকীট এক নিরাপদ অবস্থানস্থলে। তারপর শুক্রকীটকে বানাই একটি রক্তপিণ্ড, তারপর রক্তপিণ্ডকে বানাই একতাল মাংসের তাল, তারপরে মাংসের তালে আমরা সৃষ্টি করি হাড়গোড়, তারপর হাড়গোড়কে ঢেকে দিই মাংসপেশী দিয়ে, তারপর আমরা তাকে সৃষ্টি করি অন্য এক সৃষ্টিতে। সেই জন্য আল্লাহরই অপার মহিমা, কত শ্রেষ্ঠ এই স্রষ্টা।'

=> 'সম্পূর্ণ পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, এখানে ডিম্বাণুর কোনো অস্তিত্ব নেই। শুক্রকীটই রক্তপিণ্ড, একতাল মাংস, হাড়গোড়... ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। ভ্রূণ থেকে নয়! মাংসের তাল থেকে তৈরি হয় হাড়গোড়, তারপর সেটাকে ঢেকে দেওয়া হয় মাংসপেশী দিয়ে!!!'

---

[৪২] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Van_Allen_radiation_belt

উত্তর :

উক্ত আয়াতের কারণে তিনি এতই বিস্মিত হয়ে গেছেন যে, একসাথে তিনটা বিস্ময় চিহ্ন দিলেন!

মূর্খতার সীমা ছাড়িয়ে গেছেন তো, এ জন্য উক্ত আয়াতে ডিম্বাণুর অস্তিত্ব পাননি। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানব সৃষ্টির কয়েকটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। এবং মানব-প্রজননে নারীর অস্তিত্বের কথাও তাতে উল্লেখ আছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আমরা তাকে বানাই শুক্রকীট এক নিরাপদ অবস্থানস্থলে;' অর্থাৎ যোনীতে।

আর আমরা জানি যে, যৌনসঙ্গমের সময় পুরুষ ও নারী প্রজননতন্ত্রের মাঝে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে নারীর ডিম্বাণু পুরুষের শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয়। আর এখানেও তা-ই বলা হয়েছে।

উক্ত আয়াতে মানব-প্রজননে নারীর অস্তিত্ব ছাড়াও কুরআনের বৈজ্ঞানিকতার আজিব একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আমরা তাকে বানাই শুক্রকীট।' এই শুক্রকীট সম্পর্কে বিজ্ঞান পুরো বে-খবর ছিল। শুক্রকীটে ধরন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোনো ধারণাই ছিল না, যতদিন পর্যন্ত অণুবীক্ষণযন্ত্র (Microscope) আবিষ্কার না হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা অণুবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কারের শত শত বছর পূর্বে উক্ত আয়াতে শুক্রকীট সম্পর্কে বলেছেন। ঠিক তেমনিভাবে সুরা জুমারের ৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাতৃগর্ভে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে।' আল্লাহ তাআলা বিজ্ঞানের শত শত বছর আগে বলেছেন, মাতৃগর্ভে ভ্রূণ তিনটি আবরণে বেষ্টিত থাকে। আর আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এই কথাটি এই সেদিন জানতে পেরেছে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই তিনটি আবরণকে 'Leal' নামে অবহিত করা হয়।

যে আয়াতে মানব-প্রজননে নারীর অস্তিত্বের কথা পুরুষের অস্তিত্বের সাথে উল্লেখ করা হলো, সে আয়াত কীভাবে পুরুষতান্ত্রিক হয়ে গেল![৪৩]

---

[৪৩] *আত-তিবয়ান*, মুহাম্মাদ আলি আসসাবূনি, পৃষ্ঠা নম্বর ৩৪৮ ও ৩৫০।

কন্ট্রাডিকশন : ৫

'মুহম্মদ সা. একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়াদি নিয়ে তাৎক্ষণিক আয়াত।'

১। সুরা তাহরিম : আয়াত ১ : 'হে নবি, কেন তুমি নিষিদ্ধ করেছ, যা আল্লাহ তোমার জন্য বৈধ করেছেন? তুমি চাইছ তোমার স্ত্রীদের খুশি করতে? আর আল্লাহ পরিত্রাণকারী ও অফুরন্ত ফলদাতা।'

আয়াত ২ : 'আল্লাহ তোমাদের জন্য বিধান দিয়ে রেখেছেন তোমাদের শপথগুলো থেকে মুক্তির উপায়; আর আল্লাহ তোমাদের রক্ষাকারী বন্ধু, আর তিনিই সর্বজ্ঞাতা, পরমজ্ঞানী।'

আয়াত ৩ : 'আর স্মরণ করো, নবি তাঁর স্ত্রীদের কোনো একজনের কাছে গোপনে একটি সংবাদ দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যখন তা বলে দিলেন এবং আল্লাহ তার কাছে এটি জানিয়ে দিয়েছিলেন; তখন তিনি তাকে কতকটা জানিয়েছিলেন এবং চেপে গিয়েছিলেন অন্য কতকটা। তিনি যখন তাকে তা জানিয়েছিলেন তখন তিনি বললনে, কে আপনাকে এ কথা বলল? তিনি বলেছিলেন, আমাকে সংবাদ দিয়েছেন সেই সর্বজ্ঞাতা ও চিরওয়াকিফহাল।'

আয়াত ৪ : 'যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর দিকে ফেরো, কেননা তোমাদের হৃদয় ইতিপূর্বেই ঝুঁকে গিয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা উভয়ে তার বিরুদ্ধে পৃষ্ঠপোষকতা করো, তাহলে আল্লাহ, তিনিই তাঁর রক্ষাকারী বন্ধু, আর জিবরিল ও পুণ্যবান মুমিনগণ; এমনকি ফেরেশতারাও তাঁর পৃষ্ঠপোষক।'

আয়াত ৫ : 'হতে পারে তাঁর প্রভু, যদি তিনি তোমাদের তালাক দিয়ে দেন, তবে তিনি তাঁকে বদলে দেবেন তোমাদের চাইতেও উৎকৃষ্ট স্ত্রীদের—আত্মসমর্পিতা, বিশ্বাসিনী, বিনয়াবনতা, অনুতাপকারিনী, উপাসনাকারিনী, রোজাপালনকারিনী, স্বামীঘরকারিনী ও কুমারী।'

=> মুহম্মদ সা.-এর বিবিদের অন্তর্কলহ মেটাতে (অনেকের মতে উপপত্নীর সাথে নবিজির সম্পর্কে কোনো কোনো নবিপত্নী বাধা দেওয়ায়) আল্লাহ মারফত নবিজির হুংকার!"

উত্তর :

তার প্রথম কথা হলো, উক্ত আয়াতগুলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কীয়।

আর তার দ্বিতীয় কথা হলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিদের অন্তর্কলহ মেটাতে বা 'উপপত্নী'র সাথে নবিজির সম্পর্কে কোনো কোনো নবিপত্নী বাধা দেওয়ায় আল্লাহ মারফত নবিজির হুংকার। এ বিষয়ে পরে বলছি। প্রথমে উক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলে নিই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ছিল, প্রতিদিন আসরের পর তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে গিয়ে তাঁদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। একদিন হজরত যাইনাব রা.-এর কাছে গিয়ে একটু বেশি সময় অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন। আর এ রকম কয়েকদিন হলো। এই ঘটনা দেখে হজরত আয়িশা এবং হজরত হাফসা রা.-এর ঈর্ষা হলো। তাঁরা উভয়ে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে, হজরত যাইনাব রা.-এর ঘর থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁদের নিকট আসবেন তখন তাঁরা বলবেন, আপনি তো 'মাগাফির' পান করেছেন। ('মাগাফির' একপ্রকার দুর্গন্ধযুক্ত ফল এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুকে চরম অপছন্দ করতেন।)

পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা সে রকম বললে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, আমি তো মধু পান করেছি। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কসম করলেন যে, তিনি আর কখনো মধু পান করবেন না। এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে স্ত্রীকে (যার সামনে কসম করেছিলেন মধু পান করবেন না বলে) এটাও বলে দিলেন যে, এই ঘটনা অন্য কাউকে না বলার জন্য। কেননা, তা যদি হজরত যাইনাব রা.-এর কানে যায়, তাহলে তিনি কষ্ট পাবেন। কিন্তু তিনি (হজরত হাফসা বা আয়িশা রা.) এই ঘটনা অন্যজনকে বলে দিলেন।

আবার এ দিকে আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিলেন যে, আপনি যে স্ত্রীর সামনে মধু পান করবেন না বলে কসম করেছিলেন এবং তা অন্যকে জানাতেও নিষেধ করেছিলেন, সে স্ত্রী তা অন্য স্ত্রীকে বলে দিয়েছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে অস্পষ্টভাবে সেই বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা দিলেন, যাতে তিনি লজ্জাবোধ না করেন; যেহেতু রাসুলের

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তিনি তা অন্যকে বলে দিয়েছিলেন। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।[৪৪]

প্রথম আয়াতে সম্বোধন রাসুলের প্রতি, কিন্তু এরপরের আয়াতে সম্বোধন সবার প্রতি। এবং উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা রাসুলের মাধ্যমে সকল মুসলমানকে কয়েকটি বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন আইডল। আর মানুষ যাকে আইডল মানে, তার মতোই হওয়ার চেষ্টা করে। তাই রাসুলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো শিক্ষা দিয়েছেন।

প্রথমত : স্ত্রীর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখার সীমা কতটুকু। দ্বিতীয়ত : স্ত্রী যদিও স্বামীর অসন্তুষ্টিমূলক কাজ করে তাহলে নরম আচরণে কীভাবে তাকে সতর্ক করতে হবে।

তৃতীয়ত: কোনো হালাল জিনিস যদি কেউ না করার কসম করে এবং পরে সে জিনিসটিই তার জন্য উপকারী সাব্যস্ত হয়, তাহলে কসম ভঙ্গ করা বৈধ আছে। যে আয়াতে সম্বোধন রাসুলের প্রতি ও সবার প্রতি রয়েছে এবং যে বিষয়গুলোর সাথে সকল মুসলমানের শিক্ষা জড়িত, তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়' কীভাবে হলো?[৪৫]

কন্ট্রাডিকশন : ৫ (ক)

> ২। সুরা ৩৩ : ২৮ : 'হে নবি, আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা করো, তবে আসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দিই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় দিই।'

উত্তর :

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ অন্যান্য লোকদের স্বচ্ছলতা দেখে নিজেরাও স্বচ্ছল হতে চাইলেন। তখন আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর স্ত্রীগণকে এ কথা জানিয়ে দিতে বললেন, যদি তোমরা দুনিয়ার বিলাসিতা ও বড়লোকদের মত স্বচ্ছল হতে

---

[৪৪] *আসবাবুন নুজুল*: পৃষ্ঠা নম্বর ১৭৮।
[৪৫] *তাফসিরে মাআরেফুল কুরআন*, মুফতি শফি রহি., উক্ত আয়াতসমূহের তাফসির দ্রষ্টব্য।

চাও, তাহলে তোমাদের সাথে আমার মিল হতে পারে না। তোমরা যদি পার্থিব জীবনের বিলাসিতা চাও, তাহলে আমাকে তোমাদের হারাতে হবে।

আর আমাকে এবং আখেরাতে উত্তম প্রতিদান পেতে চাইলে পার্থিব জীবনের বিলাসিতার আশা ত্যাগ করতে হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ তখন দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ রাসুল এবং আখেরাতকেই গ্রহণ করলেন।

উক্ত আয়াতেও সকলের জন্য শিক্ষা রয়েছে। মানুষ যদি আখেরাতে আরাম-আয়েশের আশা করে, তাহলে তাদের দুনিয়ার বিলাসিতা ও দুনিয়াবি আরাম-আয়েশ ত্যাগ করতে হবে।[৪৬]

কন্ট্রাডিকশন : ৫ (খ)

৩। সুরা ৩৩ : ৫১ : 'হে নবি! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদের আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদের হালাল করেছি, যাদের আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে, যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোনো মুমিন নারী যদি নিজেকে নবির কাছে সমর্পণ করে, নবি তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য; অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি, আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।'

=> খাওলা বিনতে হাকিম নামে এক মহিলা নবিজির সামনে নিজেকে উপস্থাপন করে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল। তখন আয়িশা আপত্তি তুলে ওই মহিলাকে 'বেহায়া' বললে এই আয়াত নাজিল হয়। অবশ্য বুদ্ধিমান নবিপত্নী আয়িশার শেষ পর্যন্ত মন্তব্য : 'বাহ! আপানার আল্লাহ আপনার জন্য তো ফটাফট কী সুন্দর আয়াত বানিয়ে দিচ্ছেন!!'

---

[৪৬] *তাফসিরে কুরতুবি*, আবু আবদুল্লাহ আল কুরতুবি, উক্ত আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।

উত্তর :

আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বহু বিবাহের অনুমিত দিয়েছিলেন। এ জন্য অনেক নারীই চাইতেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী হয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবতী করার। এভাবে একদিন একজন নারী এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি নিজেকে আপনার নিকট সমর্পণ করছি।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথার কোনো জবাব দিলেন না। আর সেই নারীও দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। অতঃপর একজন সাহাবি সেই নারীকে বিবাহ করার অনুমতি চাইলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন এবং সেই সাহাবির সাথে উক্ত নারীর বিবাহ করিয়ে দিলেন।

প্রথমত : সেই নারীর নাম কী ছিল, তা নিয়ে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয়ত : উক্ত ঘটনার সময় হজরত আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সেখানে ছিলেনই না।

তাই এ কথাটি বলা যে, আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আপত্তি তুলেছিলেন এবং সেই মহিলাকে 'বেহায়া' বলেছিলেন, চরম মিথ্যাচার। আর সে কাজটিই করেছে এই মিথ্যুক নাস্তিকটা।[৪৭]

তৃতীয়ত : একটি বিষয় জেনে রাখা দরকার, যে সকল নারী এভাবে নিজেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সমর্পণ করেছিলেন, তাঁদের কাউকেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করেননি।[৪৮]

কন্ট্রাডিকশন : ৬

> 'মুহম্মদ সা. একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানকল্পে অহেতুক সময়ক্ষেপণ করে আয়াত।'
>
> ১। সুরা ২৪ : ৩, ৪ : 'ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মুমিনদের

---

[৪৭] *আসবাবুন নুজুল*, পৃষ্ঠা নম্বর ১৪১।
[৪৮] *তাফসিরে কুরতুবি*, আবু আবদুল্লাহ আল কুরতুবি, উক্ত আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।

জন্যে হারাম করা হয়েছে। যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান।'

=> 'নবিপত্নী আয়িশা'কে কেলেংকারি থেকে মুক্ত করা হয় এই আয়াতের মাধ্যমে। আর সমস্ত আয়াত ফটাফট নাজিল হলেও এই আয়াত নাজিল হতে প্রায় এক মাসের অধিক সময় লাগে। এই এক মাস নবিজি যথেস্ট কনফিউজড ছিলেন (আয়িশা যখন জিজ্ঞেস করে যে, তিনি তাকে সন্দেহ করছেন কি না তখনও নবিজি সরাসরি কিছু জবাব দেননি)। শেষে ঘনিষ্ঠ সাহাবিদের পরামর্শ চাইলে একমাত্র আলি রা. জানান, এই অসতী মহিলাকে তালাক দিয়ে দিন, কিন্তু বাকি সবাই পরামর্শ দেন, নবিপত্নীকে তালাক দেওয়াটা ভালো কাজ হবে না। এর পরদিনই এই আয়াত নাজিল হয়।'

উত্তর :

প্রথমত : উক্ত আয়াত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানকল্পে নয়।

দ্বিতীয়ত : এই আয়াত মা হজরত আয়িশা রা.-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি।

মূলত এসব নাস্তিক শ্রেণি যে ধরনের সমাজব্যবস্থা চায়—অর্থাৎ একটি ব্যভিচারযুক্ত, অবাধ যৌনাচারের অনুমোদনপ্রাপ্ত সমাজব্যবস্থা—আলোচ্য আয়াত এবং তার পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে সে সমাজব্যবস্থার চরম বিরোধিতা করে কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ জন্য এই নাস্তিক লেখক তার আক্রোশ কুরআন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মা হজরত আয়িশা রা.-এর ওপর মিথ্যাচার করে চরিতার্থ করেছে।

উক্ত আয়াতের অর্থ দুই রকম—প্রথম অর্থ : ব্যভিচারী পুরুষ শুধু ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীর সাথেই ব্যভিচার করে। অর্থাৎ ব্যভিচারী পুরুষ যে নারীর সাথে ব্যভিচার করে, সেই নারীটিও ভালো নয়; বরং সেও খারাপ ব্যভিচারিণী মহিলা।

দ্বিতীয় অর্থ : ব্যভিচারী পুরুষ শুধু ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিবাহ করে। অর্থাৎ কোনো ভালো পুরুষের জন্য কোন ব্যভিচারিণী নারীকে এবং কোনো ভালো নারীর জন্য কোনো ব্যভিচারী পুরুষকে বিবাহ করা বৈধ নয়।[৪৯]

উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট : মুরশিদ নামে একজন সাহাবি ছিলেন। আইয়ামে জাহিলিয়াতে একজন মুশরিকা নারীর সাথে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেই মুশরিকা নারীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এরপর তিনি একদিন একটি কাজে মক্কায় গমন করেন। মক্কায় যাওয়ার পর ঘটনাক্রমে সেই মুশরিকা নারীর সাথে তাঁর দেখা হয়ে যায় এবং সেই নারী তাঁকে একসাথে রাত্রি যাপনের আহ্বান জানায়। তখন তিনি সেই নারীকে নিষেধ করে বলেন, আল্লাহ তাআলা ব্যভিচার করতে নিষেধ করেছেন।

অতঃপর হজরত মুরশিদ রা. মদিনায় ফিরে যান এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন তিনি সেই নারীকে বিবাহ করতে পারবেন কি না। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।[৫০]

কন্ট্রাডিকশন : ৭

'আজকের নীতি-নৈতিকতার বিচারে বর্বর ও চরম অনৈতিক আয়াত (এটারও ভুরি ভুরি নজির আছে) ঘৃণা, হত্যা, জোর-জবরদস্তি।'

১। সুরা ২ : ১৯১, ১৯২, ১৯৩ : 'আর তাদেরকে হত্যা করো, যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে, যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুত: ফেতনা-ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে। তাহলে তাদেরকে হত্যা করো। এই হলো কাফেরদের শাস্তি। আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু।

আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়ে

---

[৪৯] *তাফসিরে উসমানি*, উক্ত আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।

[৫০] *আসবাবুন নুজুল*, পৃষ্ঠা নম্বর ১২১।

যায় তাহলে কারও প্রতি কোনো জবরদস্তি নেই, তবে যারা জালেম (তাদের ব্যাপারে আলাদা)।'

২। সুরা ২ : ২১৬ : 'তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো-বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয়, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত: আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।'

৩। সুরা ৩ : ৫৬ : 'অতএব যারা কাফের হয়েছে, তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দেবো দুনিয়াতে এবং আখেরাতে। তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।'

উত্তর

এ বিষয়ক সুরা বাকারার ১৯১, ১৯২, ১৯৩ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা এবং অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়ে গেছে। এবং ২ : ২১৬ ও সুরা ৩ : ৫৬ আয়াত সম্পর্কীয় আলোচনা করা হয়েছে।

কন্ট্রাডিকশন : ৭ (ক)

'নারীর অবমূল্যায়ন।'

সুরা ২ : ২২৩ : 'তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার করো। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো যে, আল্লাহর সাথে তোমাদের সাক্ষাত করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের সুসংবাদ জানিয়ে দাও।'

২। সুরা ২ : ২২৮ : 'আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়জ পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাত দিবসের ওপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েজ নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে,

তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।'

৩। সুরা ২ : ২৩০ : 'তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেওয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোনো স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অত:পর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোনো পাপ নেই। যদি আল্লাহর হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। আর এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা; যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়।'

৪। সুরা ৪ : ৩৪ : 'পুরুষেরা নারীদের ওপর কৃর্তত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের ওপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন, লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাজত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং প্রহার করো। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোনো পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার ওপর শ্রেষ্ঠ।"

উত্তর :

ইসলামপূর্ব যুগে নারীদের মর্যাদার চরম অবমূল্যায়ন হতো। পুরুষরা নারীদের পশুর মতো ব্যবহার করত, মানুষ বলে স্বীকারই করত না। ইহুদিরা নারীদের অভিশপ্ত মনে করত, তাই যখন কোনো নারীর পিরিয়ড শুরু হতো তখন সেই নারীকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে আলাদা একটি ঘরে বন্দি করে রাখত। আর জাহেলি যুগের অবস্থা তো আরও মারাত্মক ছিল। কারও কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলত।

একজন নারীর সাথে দশজন পুরুষ সহবাস করত। অতঃপর নারী যখন গর্ভবতী হতো, তখন লটারির মাধ্যমে সেই দশ জন পুরুষ থেকে একজনকে গর্ভবতী নারীর সন্তানের পিতা হিসেবে নির্ধারণ করা হতো। কোনো নারীর পিতা বা স্বামী মারা গেলে সে তাদের সম্পত্তিতে অংশ পেত না।

এরপর আসল ইসলাম। নারীকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিলো, নারীর মর্যাদার মূল্যায়ন করলো।

ইসলাম ঘোষণা দিলো, নারীরা তোমাদের মতোই মানুষ। তাই পিরিয়ড চলাকালীন কোন নারীকে তোমরা ইহুদিদের মতো ঘর থেকে বের করো না। ইসলাম বললো, কন্যা সন্তান তোমাদের জন্য নিয়ামতস্বরূপ। তোমরা তাদের জীবন্ত পুঁতে ফেললে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবে—'আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়। আর সে অন্তর্জ্বালায় হতে থাকে পিষ্ট। তাকে যে (কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণের) সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তাকে খারাপ মনে করে সে জনপদ থেকে আত্মগোপন করে। (আর মনে মনে ভাবে) অপমান সয়ে কি একে রেখে দেবে নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রাখো, তারা যা (কন্যা সন্তান পুঁতে ফেলার) ফায়সালা করে তা কতই না মন্দ!'

'আর স্মরণ করো সেই দিনের কথা, যখন জীবন্ত পুঁতে ফেলা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?'[৫১]

ইসলাম বলল, তোমরা যে নারীকে বিবাহ করো, সে নারী শুধু তোমারই। জাহিলিয়্যাত যুগের মতো তাতে অন্য কারও অধিকার নেই। তার সাথে কেউ পরকীয়া করতে পারবে না। তোমার নারীকে তুমি সেভাবেই ভালোবাসো, যেভাবে তুমি তোমার সম্পত্তিকে ভালবাসো। তোমার সম্পত্তিতে যেভাবে অন্য কারও দখল সহ্য করতে পারো না, সেভাবে তোমার নারীতে অন্য কারো দখল সহ্য করো না। তোমার নারীর গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, তা তো তোমার ভবিষ্যতের পাথেয়।

ইসলাম বললো, তোমরা তোমাদের নারীদের ওপর জুলুম করা থেকে বিরত থাকো এবং সে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। যেভাবে তোমাদের হক রয়েছে নারীদের ওপর, সেভাবে তাদেরও হক রয়েছে তোমাদের ওপর।

ইসলাম বললো, তোমাদের নারীগণও তাদের স্বামী এবং পিতার সম্পত্তিতে অংশ পাবে। তোমরা তাদের হক আদায়ে সতর্ক থেকো।

---

[৫১] সূরা নাহল : ৫৮-৫৯, সূরা আত-তাকউইর : ৮।

ইসলাম নারীর জন্য এত কিছু করল, জাহেলি যুগের কুসংস্কারসহ অন্যান্য ধর্মের কুসংস্কার ভেঙ্গে দিলো, তারপরও নাকি ইসলাম নারীকে মূল্যায়ন করেনি! বড় আজিব কথা!

সুরা বাকারার ২২৩ নম্বর আয়াত—'তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র।'

প্রথমত : উক্ত আয়াতে জাহেলি যুগের একটি কুসংস্কারকে খণ্ডন করা হয়েছে। জাহেলি যুগের মানুষরা মনে করত, স্বামী যদি তার স্ত্রীর সামনের রাস্তায় পেছন দিক থেকে সহবাস করে, তাহলে সে সহবাস থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে সন্তান পঙ্গু হবে। আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে সে কুসংস্কার খণ্ডন করে বলেন—'তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদের সঙ্গে উপগত করো।' অর্থাৎ স্ত্রীর সামনের রাস্তায় যে পজিশন থেকে ইচ্ছা সে পজিশন থেকে সহবাস করতে পারো। জাহেলি যুগের কুসংস্কারকে বিশ্বাস করো না।'[৫২]

দ্বিতীয়ত : উক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলা স্ত্রীকে স্বামীর জন্য মূল্যবান এবং প্রিয় হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এ কথা বলে—'তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র...আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা করো।' অর্থাৎ বীর্য হলো বীজস্বরূপ এবং সন্তান হলো ফলস্বরূপ। জাহেলি যুগের মতো একজন নারীকে যেভাবে একাধিক পুরুষ ব্যবহার করত, তোমরা সেভাবে করো না; বরং স্ত্রী হলো স্বামীর জন্য সবচেয়ে মূল্যবান। তাই তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সেভাবে ভালোবাসো, যেভাবে নিজের সম্পত্তিকে ভালোবাসো। নিজ সম্পত্তিতে যেভাবে অন্যের দখল সহ্য করতে পারো না, সেভাবে তোমার স্ত্রীতে অন্যের দখল সহ্য করো না। এই স্ত্রীর গর্ভের সন্তান হলো তোমাদের ভবিষ্যৎ পাথেয়। যখন তোমরা আগামী দিনে বৃদ্ধ হয়ে যাবে, তখন সে সন্তানই তোমাদের কাজে লাগবে, তোমাদের বৃদ্ধ বয়সের পাথেয় হবে।[৫৩]

এই আয়াতে নারীর অবমূল্যায়ন কীভাবে হলো? উক্ত আয়াতে তো একজন স্বামীকে শেখানো হয়েছে কীভাবে সে তার স্ত্রীকে ভালবাসবে। স্ত্রীকে স্বামীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ করা হয়েছে। জাহিলিয়াত যুগের প্রথাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

---

[৫২] *আসবাবুন নুজুল*, পৃষ্ঠা নম্বর ৩২।
[৫৩] *তাফসিরে উসমানি*, উক্ত আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।

মূলত যারা গলা ফাটিয়ে নারীর মূল্যায়নের স্লোগান দেয়, প্রকৃত ভণ্ড তারাই; তারাই নারীর অবমূল্যায়ন করে।

সুরা বাকারার ২২৮ নম্বর আয়াত—'আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়জ পর্যন্ত।'

উক্ত আয়াতে বলা হচ্ছে, কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে সেই নারী যেন তিন পিরিয়ড অতিবাহিত হওয়ার আগে অন্য কোনো পুরুষকে বিবাহ না করে। কেননা, তিনটি পিরিয়ড অতিবাহিত হলে বোঝা যাবে, স্ত্রী গর্ভবতী কি না। আর যদি স্ত্রী এ কথা জেনে থাকে যে, সে তালাকদাতা স্বামীর দ্বারা গর্ভবতী, তাহলে গর্ভকে লুকিয়ে রেখে নতুন কোনো স্বামীকে গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ নয়; বরং গর্ভের কথা সে যেন জানিয়ে দেয়। যাতে একজনের সন্তানে অন্যজনের মিশ্রণ না হয়। অতঃপর সে যদি গর্ভবতী না হয়, তাহলে তিন পিরিয়ড অতিবাহিত হলে নিজ ইচ্ছামতে যাকে ভালো লাগে তাকে বিবাহ করতে পারবে।

উক্ত আয়াতে একটি সাধারণ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। নিশ্চয় কোন পুরুষই চাইবে না সে এমন নারীকে বিবাহ করুক, যে অন্যের সন্তান নিজের পেটে লুকিয়ে রেখেছে। আবার সে নারীর প্রথম স্বামীও চাইবে না যে, তার সন্তানাদিতে অন্য কেউ ভাগ বসাক।

২৩০ নম্বর আয়াত—'তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয়া হয়...।'

উক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলা জাহেলি যুগের একটি প্রথাকে বিলুপ্ত করেছেন। জাহেলি যুগে স্বামী তার স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বারবার তালাক দিত। যেমন : কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে প্রথমে এক তালাক দিত এবং পরবর্তী এক মাস স্ত্রীর সাথে সংসার করত না। আর এই এক মাস স্ত্রী মানসিকভাবে খুব কষ্ট পেত। স্বামী তাকে আবার ফিরিয়ে নেবে কি নেবে না এই ভয়ে গোটা মাস কেটে যেত। এরপর মাস শেষে স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিত। অতঃপর আবারও স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে তালাক দিত এবং একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করত। আর তারা এভাবে করাকে বৈধ মনে করত।

আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে সেই প্রথাকে বিলুপ্ত করে তালাকের একটি লিমিট ঠিক করে দেন; যাতে করে স্বামীরা জাহেলি যুগের মতো স্ত্রীদের নিয়ে খেলতে না পারে, মানসিকভাবে কষ্ট দিতে না পারে।[৫৪]

---

[৫৪] *আসবাবুন নুজুল*, পৃষ্ঠা নম্বর ৩৩, *তাফসিরে মাআরেফুল কুরআন*, তাফসির দ্রষ্টব্য।

উক্ত আয়াত তো নারীর জন্য। নারী এবং তালাক কোনো খেলনা নয়—তা বোঝানোর জন্য। উক্ত আয়াত দ্বারা তো নারীকেই সম্মানিত করা হয়েছে। একচোখা নাস্তিকরা তা দেখবে কীভাবে?

সুরা নিসার ৩৪ নম্বর আয়াত, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা নারীর ওপর পুরুষের কৃর্তত্বশীল হওয়ার কারণ বলে এটাও বলে দিয়েছেন, পুরুষ যেন নারীর জন্য অর্থ ব্যয় করে। নারীর খরচাদি বহন করে। নারীর জন্য জরুরি নয় পুরুষের জন্য অর্থ ব্যয় করা, পুরুষের খরচাদি বহন করা। উক্ত আয়াতসহ উপরিউক্ত আয়াতগুলো ভালো চোখে দেখে পড়লেই বোঝা যাবে, ইসলাম নারীকে কত সম্মানিত করেছে। নারীর মর্যাদার মূল্যায়ন ইসলাম যেভাবে করেছে পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মই তেমন করেনি।

কন্ট্রাডিকশন : ৮

একই কথার অহেতুক পুনরাবৃত্তি একই সুরায়।

সুরা ১০৯ : ৩-৫ : 'এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি।'

'তোমরা ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি।'

উত্তর :

এখানে 'একই' কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়নি, বরং একটি আয়াতে বর্তমান কালকে নির্দেশ করা হয়েছে এবং অন্যটিতে ভবিষ্যৎ কালকে নির্দেশ করা হয়েছে।

সুরা কাফিরুনের তিন নম্বর আয়াত—'এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি।'

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত তোমরা যে সকল উপাস্যের উপাসনা করো, আমি বর্তমানেও সেগুলোর উপাসনা করি না। এবং তোমরাও বর্তমানে সেই একক ও অমুখাপেক্ষী সত্তার উপাসনা করো না, যাঁর উপাসনা আমি করি। এরপর পাঁচ নম্বর আয়াত—'তোমরা ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি।' অর্থাৎ (বর্তমানের মতো) ভবিষ্যতেও আমি তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা করব

না এবং তোমরাও আমার একক অমুখাপেক্ষী সত্তা তথা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে না।'[৫৫]

কন্ট্রাডিকশন : ৯

অর্থহীন অক্ষরসমষ্টি।

১। সুরা ২ : ১ : 'আলিফ-লাম-মীম'

২। সুরা ২৭ : ১ : 'ত্বা-সীন'

উত্তর :

এগুলো অর্থহীন কোনো অক্ষরসমষ্টি নয়; বরং সাহাবিগণসহ প্রায় সকল কুরআন-ব্যাখ্যাকারীগণ বলেন, এগুলো অর্থবোধক অক্ষরসমষ্টি এবং আল্লাহ তাআলার এক গোপন রহস্য। আর এ জন্য আল্লাহ তাআলা এগুলোর অর্থ মানুষের কাছে প্রকাশ করেননি। আবার কুরআন-ব্যাখ্যাকারীগণের অনেকেই এগুলোর অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন।

যদি এগুলো অর্থহীন অক্ষরসমষ্টি হতো, তাহলে এগুলো পড়ার কারণে কোনো সওয়াবই পাওয়া যেত না। অথচ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, 'আলিফ-লাম-মিম' পড়লে ত্রিশটি নেকি পাওয়া যায়। প্রতি অক্ষরে দশটি করে নেকি।[৫৬]

কন্ট্রাডিকশন : ১০

'কোরআনের ওই সব আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, যা মুহম্মদ সা. নিজেই মানেন নি।'

১। সুরা ৪ : ৩ : 'আর যদি তোমরা ভয় করো যে, এতিম মেয়েদের হক যথাথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়ের মধ্যে থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা করো যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।'

---

[৫৫] *আশরাফুত তাফাসির*, তাফসির দ্রষ্টব্য। *তাফসিরে উসমানি*, তাফসির দ্রষ্টব্য।

[৫৬] *আল-ইতকান*, খণ্ড নম্বর ০৩, পৃষ্ঠা নম্বর ২৮২-২৮৪।

উত্তর :

বেচারা কুরআনের কন্ট্রাডিক প্রমাণ করতে গিয়ে নিজেই নিজের কথার স্ববিরোধিতা করছে বারবার!

তার কথা হলো উক্ত আয়াতে একটি, দুটি, তিনটি বা চারটি বিবাহ করতে পুরুষদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ চারের অধিক বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা না মেনে চারটির বেশি বিবাহ করেছেন।

সে পূর্বে ৫ নম্বর কন্ট্রাডিকশনে কয়েকটি আয়াত নিয়ে এসেছিল এই বলে যে, **'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়াদি নিয়ে তাৎক্ষণিক আয়াত।'**

এবং সে আয়াতগুলোর একটি আয়াত হলো এটি—'হে নবি, আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদের আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদের হালাল করেছি, যাদের আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোনো মুমিন নারী যদি নিজেকে নবির কাছে সমর্পন করে, নবি তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য; অন্য মুমিনদের জন্য নয়—আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি, আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।'[৫৭]

উক্ত আয়াতে দেখুন, আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসালাম-এর স্ত্রীগণ ব্যতিত আরও কিছু মহিলা, যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয় এবং যারা তাঁর সাথে হিজরত করেছিলেন, তাঁদেরকেসহ যেকোনো মুমিন নারীকে বিবাহ করার জন্য (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে) অনুমতি দিয়েছেন। তাহলে বোঝা গেল যে, আয়াতে পুরুষদের চারটি বিয়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে, সে আয়াত সাধারণ মুসলমানদের জন্য; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা সুরা আহযাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে একাধিক বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

---

[৫৭] সুরা আহযাব : ৫।

তাহলে কীভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের আদেশ মানেননি? যে মানুষগুলোর সামান্যতমও যোগ্যতা নেই কুরআনকে বোঝার, সেসব মূর্খরা কীভাবে কুরআন নিয়ে পসরা সাজানোর দুঃসাহস দেখায়!

আল্লাহ তাআলা এসব মূর্খদের বিকৃতি থেকে কুরআনুল কারিমকে হিফাজত করুন। আমিন।

মানবিক গ্রন্থ কোরান

'কুরআনুল কারিম এমন একটি সমন্বিত গ্রন্থ যে, অতীত হতে আজ পর্যন্ত পৃথিবীবাসী কুরআনের সমকক্ষ কোন গ্রন্থ উপস্থিত করতে পারেনি। সব বিষয়ের সমাধান কুরআনেই রয়েছে। আপনি যে ধরনের সমস্যায় পড়েন না কেন, তার সমাধান অবশ্যই কুরআনে খুঁজে পাবেন। তবে শর্ত হলো, আপনার মধ্যে কুরআন বোঝার যোগ্যতা থাকতে হবে। আর সে কথা কুরআন নিজেই বলেছে—'প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী।' (সুরা নাহল : ৮৯)[৫৮]

---

[৫৮] আল্লামা শাহ আহমদ শফী দা.বা., *আল-খাইরুল কাসির* : ৬ নম্বর পৃষ্ঠা।

মানবিক গ্রন্থ কোরান[৫৯]

আসিফ মহিউদ্দীন

কথোপকথন

আস্তিক

'আপনি তো নাস্তিক। আপনি ইসলামের কী বুঝবেন? ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম। ইসলাম কোনোভাবেই কোন অবস্থাতেই মানুষ হত্যার অনুমতি দেয় না।

আসিফ মহিউদ্দীন

- '৯/১১-এর থেকে গুনলে এই পর্যন্ত সর্বমোট পুরো পৃথিবীতে ইসলাম দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং ইসলামি শান্তিবাদী জঙ্গিদের দ্বারা আক্রমণ হয়েছে ২৮৭২৫ বার। প্রায় প্রতিবারই 'নারায়ে তাকবির, আল্লাহ আকবার' বলে হামলা করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এতে জবাই হয়েছে, হিন্দু ইহুদি খ্রিষ্টান, এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও ভিন্ন মতাবলম্বীরা বাদ যায় নি। একে কীভাবে শান্তির ধর্ম বলা যেতে পারে?'

জবাব :

এই কথোপকথনটা আসিফ মহিউদ্দীনের লেখা। 'আস্তিক' শিরোনামে যে আস্তিক চরিত্রের ডায়লগ আছে, তাও আসিফ মহিউদ্দীনের লেখা। আসিফ মহিউদ্দীন নিজের মনমতো একটি আস্তিক চরিত্র সাজিয়েছেন। এরপর তিনি আস্তিক চরিত্র দিয়ে প্রশ্ন করিয়ে নিজেই উত্তর প্রদান করেছেন। তাই কথোপকথনটা বোঝার জন্য আমি আস্তিক চরিত্রের নাম 'আস্তিক' রেখেছি এবং আসিফ মহিউদ্দীনের উত্তরগুলোতে তার নাম বসিয়ে দিয়েছি। আর তাদের কথোপকথনের মাঝে

---

[৫৯] https://www.nastikya.com/archives/৪৬০।

'জবাব' শিরোনামে আমি আমার বক্তব্য বলেছি। মূলত এই কথোপকথনের মাধ্যমে আসিফ মহিউদ্দীন যেসব আপত্তি তুলেছেন, তা মিথ্যাচার, স্ববিরোধিতা ও মূর্খতা-সংবলিত। সত্যকে অস্বীকার করে তিনি অবলীলায় মিথ্যাচার করে গেছেন। বাস্তবতা এবং সুস্পষ্ট সত্যকে একপাশে রেখে নির্লজ্জভাবে এমন ঢংয়ে তারা সবাই মিথ্যা বলেন যে, মিথ্যাকেই বাস্তবতা ও সত্য বলে মনে হয়। তার নমুনা ওপরেই আছে।

ওপরে তিনি ইসলামকে জঙ্গিধর্ম এবং ইসলামের অনুসারীদের জঙ্গিবাদী বানিয়ে দিয়েছেন। পুরো পৃথিবীতে নাকি মুসলিমরাই ২৮৭২৫ বার হামলা করেছে এবং সেসব হামলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ জবাই হয়েছে।

কিন্তু ইউরোপোলের রিপোর্ট ভিন্ন কথা বলে। ইউরোপোলের রিপোর্ট অনুযায়ী পুরো বিশ্বে ৯৯.৬ শতাংশ হামলা হয়েছে অমুসলিম তথা খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মালম্বীদের দ্বারা। মাত্র ৫ শতাংশ হামলার জন্যেও মুসলিমরা দায়ী নয়।

আর মুসলিমদের চরম শত্রু এফবিআইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী শুধু আমেরিকাতে ৯৪ শতাংশ হামলা হয়েছে অমুসলিমদের দ্বারা এবং বাকি মাত্র ৬ শতাংশ হামলা হয়েছে মুসলিমদের দ্বারা। আর এটাই তো বাস্তবতা। খ্রিষ্টীয় আমেরিকা ও ন্যাটোবাহিনী আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, সোমালিয়া, ইয়েমেনসহ অন্যান্য মুসলিম দেশে হাজার হাজার টন ওজনের বোমা ফেলে শিশুসহ লাখো নিরীহ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। ইহুদিবাদী ইসরাইল ফিলিস্তিনের জনগণকে হররোজ জীবন্ত কবর দিচ্ছে। হিন্দুবাদী ভারত কাশ্মীরকে মৃত্যুকূপ বানিয়ে রেখেছে।

আর বৌদ্ধের অনুসারী মায়ানমার তো রাখাইন রাজ্যকে পৃথিবীর জাহান্নাম বানিয়েছে।[৬০]

তাহলে ইসলাম কীভাবে সন্ত্রাসী ধর্ম হলো! সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম নেই। নিশ্চয় ধার্মিকরা সন্ত্রাসী নয়। ইসলামে রয়েছে জিহাদের শাশ্বত বিধান। কিন্তু সন্ত্রাস আর জিহাদ তো এক বিষয় নয়। পৃথিবী থেকে সন্ত্রাসকে নির্মূল করার জন্য বিধিবদ্ধ

---

[৬০] University of North Carolina,recent report tracking Islamist militancy in America https://goo.gl/wqPy3u
ইউরোপোল ইইউ টেরোরিজম সিচুয়েশন অ্যান্ড ট্রেন্ড রিপোর্ট।

হয়েছে জিহাদ। একমাত্র অথর্ব অর্বাচীনরাই জিহাদকে সন্ত্রাস বলে অভিহিত করতে পারে।

আস্তিক

-'দেখেন ভাই, কোরআনে স্পষ্ট বলা আছে, যে-কেউ প্রাণের বিনিময় প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে।'

আসিফ মহিউদ্দীন

'খুব ভাল আয়াত। আচ্ছা, এর ঠিক পরের আয়াতটি কি একবার পড়ে দেখবেন? সেখানে বলা হচ্ছে, 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয় , তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটা হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।'

এই আয়াতটি কি আপনার যথেষ্ট শান্তিপুর্ণ মনে হচ্ছে? যেখানে মুক্তমনা নাস্তিকরা বলছে, জঙ্গিরা মানুষ হত্যা করলেও যেন তাদের ক্রসফায়ারে না দেওয়া হয়, মেরে না ফেলা হয়, তাদের সাথে যেন সুবিচার করা হয়, সেখানে মহান করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহর এটা কী রকম কথা? হত্যা, শূলীতে চড়ানো, হাত-পা কেটে ফেলা!

জবাব :

আয়াতগুলোর ব্যাপারে বলার আগে কিছু প্রশ্ন আমার মাথায় উঁকি দিচ্ছে। আচ্ছা! ২০১৩ সালে যুদ্ধাপরাধীদের শূলীতে চড়িয়ে ফাঁসি দেয়ার দাবি জানিয়ে কারা শাহবাগ চত্বরে গলা ফাটিয়ে আন্দোলন করেছিল? শূলীতে চড়ানো, ফাঁসি দেওয়া তো অমানবিক! আসিফ মহিউদ্দীনসহ তার সাথিরা কীভাবে একটি অমানবিক কাজের জন্য আন্দোলন করতে পারল? তাও আবার যেইসেই আন্দোলন নয়; বরং মানবিকতার চরম উদাহরণ হিসেবে বড় বড় তিনটি মেডিকেলের রোড ব্লক করে রাখে, যার কারণে চিকিৎসা নিতে আসা অসুস্থ মানুষজন হেঁটে হেঁটে মেডিকেলগুলোতে যেতে বাধ্য হয়! আন্দোলনের কারণে একটা মাস রাস্তায় যানজট সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়। এরচে' পরম

মানবতার দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে! এরাই নাকি সবচে বড় মানবিক মানুষ। আর ইসলাম?

যে-কেউ প্রাণের বিনিময় প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে।'

ইসলাম পৃথিবীবাসীর শৃঙ্খলার জন্য এত সুন্দর ঘোষণা দিয়েও অমানবিক! পৃথিবীবাসীর সকল সমস্যার সমাধান দিয়েও কুরআন অমানবিক! কুরআনের মতো মানবিক গ্রন্থ ইতিপূর্বেও তো কেউ পেশ করতে পারেনি, আর ভবিষ্যতেও পারবে না।

উক্ত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা :

কুরআন শুধু উপাসনামূলক গ্রন্থ নয়, বরং কুরআনে যেভাবে উপাসনার নিয়ম-কানুন বর্ণনা করা হয়েছে, সেভাবে রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতিসহ সব বিষয়ের নিয়ম-কানুন বর্ণনা করা হয়েছে।

সুরা মায়েদার উক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা রাষ্ট্র পরিচালনার একটি আইন বর্ণনা করেছেন। ওপরে উল্লেখিত প্রথমে আয়াতে আল্লাহ তাআলা দেশে বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসীদের জন্য উপদেশমূলক বলেছেন, 'কোনো নিরপরাধ মানুষ হত্যা করা মানে গোটা মানবজাতিকে হত্যা করা।' এবং এরপরের আয়াতে সেসব সন্ত্রাসীর শাস্তির কথা বর্ণনা করেছেন। আর এই শাস্তিগুলো কোনো নিরপরাধ মানুষের জন্যে নয়, বরং সন্ত্রাসীদের জন্য।

যদি কোনো সন্ত্রাসী দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, বা কাউকে হত্যা করে তাহলে তাকে উল্লেখিত চারটি শাস্তির একটি ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ যদি কোনো সন্ত্রাসী দেশে সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রম করে কোনো নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, তাহলে নিরপরাধ মানুষকে হত্যার শাস্তিস্বরূপ তাকেও হত্যা করা হবে। আর যদি সেই সন্ত্রাসী হত্যাকাণ্ডের সাথে সাথে নিহত ব্যক্তির সম্পদও লুট করে, তাহলে তাকে শূলীতে চড়িয়ে শাস্তি দিতে হবে। আর যদি এমন হয় যে, সেই সন্ত্রাসী কাউকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু যেকোনো কারণে হত্যা করতে পারেনি, তবে সে সম্পদ লুট করেছে, তাহলে শাস্তিস্বরূপ তার হাত-পা কেটে ফেলা হবে। আর যদি সম্পদ লুট করার সময় ধরা পড়ে যায়, তাহলে তাকে শাস্তিস্বরূপ দেশান্তর করা হবে।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এসব আইন ফলো করা কি অমানবিক? যদি অমানবিক হয়, তাহলে সন্ত্রাসী যে সাধারণ নিরীহ মানুষকে সম্পদের লোভে হত্যা করল, তার কী হবে?[৬১]

কুরআন রাষ্ট্র পরিচালনার এসব আইন বর্ণনা করার কারণে যদি অমানবিক গ্রন্থ হয়, তাহলে প্রথমত পৃথিবীর প্রতিটা সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এসব আইন ফলো করার কারণে অমানবিক।

দ্বিতীয়ত : পৃথিবীর সকল মানুষজনই অমানবিক কোর্ট-কাছারিতে একজন অন্যজনের বিরুদ্ধে মামলা দাখিল করার কারণে, এসব আইন ফলো করার কারণে।

নিয়মনীতিহীন একটি পৃথিবীর কল্পনা করুন—মগেরমুল্লুকের মতো। যে পৃথিবীতে শৃঙ্খলার জন্য আইন নামক কোনো বিষয় থাকবে না। যার যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবেই চলতে পারবে। ইচ্ছে করলে যে-কাউকে হত্যা করতে পারবে, ধর্ষণ করতে পারবে, সম্পদ লুট করতে পারবে।

সে পৃথিবীটা কেমন হবে? কল্পনা করে দেখুন কেমন হবে।

আসিফ মহিউদ্দীন

'আচ্ছা, এটা না হয় বাদ দিলাম, নিচের আয়াত কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?'
'অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে পাও, তাদের বন্দি করো এবং অবরোধ করো। আর প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের সন্ধানে ওত পেতে বসে থাকো। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু। কোরান ৯ : ৫।'

জবাব :

এটা সুরা তাওবার পাঁচ নম্বর আয়াত। এই আয়াতের যোগসাজশ হলো প্রথম আয়াতের সাথে। সুরা তাওবার প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন আমরা একটু দেখে নিই—'(এটা) আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে চুক্তি বাতিলের ঘোষণা মুশরিকদের প্রতি, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে।'

---

[৬১] *তাফসিরে উসমানি*, উক্ত আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।

দেখা যাচ্ছে, এই সুরাটি মুশরিকদের সাথে কোনো একটি চুক্তি বাতিলের স্পষ্ট ঘোষণা হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। সেই চুক্তিটা কী ছিল?

সংক্ষেপে তার ইতিহাসটা একটু দেখে নেই।

আইয়ামে জাহিলিয়াত, যাকে অন্ধকার বা মূর্খতার যুগ হিসেবে আমরা জানি। সে যুগ অবাধ যৌনাচারের যুগ ছিল। সে যুগ বর্তমান নাস্তিকদের পূর্বপুরুষদের যুগ ছিল। নাস্তিকরা যে রকম সমাজ চায়, সে যুগটা ঠিক সে রকম ছিল।

সে যুগের লোকেরা তাদের কন্যা সন্তানদের জীবন্ত পুঁতে ফেলত। নারীরা চরম নির্যাতিত ছিল সে যুগে। স্বামী মারা গেলে স্ত্রী মৃত স্বামীর সম্পত্তির কোন অংশ পেত না। বাবা মারা গেলে সৎ মাকে সন্তান বিবাহ করে ফেলত। আপন ফুফু-খালাকে সামাজিকভাবে বিবাহ করা বৈধ ছিল। সমাজে হানাহানি, মারামারির জয়-জয়কার ছিল। সমাজ ব্যবস্থা এবং শৃঙ্খলা বলতে কিছুই ছিল না। কারণ, সমাজ ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হলে তো নিয়ম-কানুন লাগে, আইন লাগে। যা নাস্তিকদের কথানুযায়ী অমানবিক!

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করলেন। মূর্খতার যুগের সমাপ্তি হলো, জ্ঞানের যুগের সূচনা হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার মুশরিকদের আহ্বান করলেন তারা যেন মূর্খতার যুগের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে জ্ঞানের যুগে প্রবেশ করে। অপকর্ম ছেড়ে সৎকর্মের পথ অনুসরণ করে, ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করে। কেউ রাসুলের ডাকে সাড়া দিলো আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিল। যারা মুখ ফিরিয়ে নিল, তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-সহ মুসলমানদের ওপর চরম নির্যাতন করা শুরু করল—সৎ কর্ম ও সরল পথের দিকে আহ্বান করার কারণে। তাদের (মুশরিকদের) নির্যাতনের কারণে একসময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথিগণ মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যান। মদিনায় যাওয়ার পর ছয় হিজরিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি মক্কায় উমরাহ পালনরত অবস্থায় রয়েছেন। রাসুল তাঁর স্বপ্নের কথা সাহাবিগণকে বললেন। সাহাবিরা স্বপ্নের কথা শুনে খুব উৎসাহিত হলেন।

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে তাদের নিয়েই ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার পথ ধরলেন। হুদাইবিয়া নামক স্থানে আসার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জামাতা হজরত উসমান রা.-কে মক্কায় প্রেরণ করলেন মক্কার মুশরিকদের এই সংবাদ দেওয়ার জন্য যে-

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ওমরা পালনের জন্যই মক্কায় এসেছেন; যুদ্ধের জন্য আসেননি। ওমরা পালন করে তিনি আবার মদিনায় ফিরে যাবেন।

মক্কার মুশরিকরা তখন তাদের একটি প্রতিনিধিদল পাঠাল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আলোচনার জন্য। প্রতিনিধি দল এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একটি সন্ধিচুক্তি করতে চাইল। রাসুলও তাদের সন্ধিতে সম্মতি দিলেন।

সন্ধির শর্তগুলো এমন ছিল :

- মুসলমানগণ এ বছর ওমরা না করেই মদিনায় ফিরে যাবে এবং আগামী বছর ওমরা পালনের জন্য এসে তিন দিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না।

- কুরাইশ এবং মুসলমানদের মাঝে আগামী দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।
- কুরাইশদের কোনো লোক মদিনায় আশ্রয় নিলে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে, কিন্তু কোনো মুসলিম মক্কায় আশ্রয় নিলে কুরাইশরা তাকে মদিনায় ফেরত পাঠাবে না।

- আরবদের যেকোনো গোত্র এ সন্ধিচুক্তিতে মুসলমান বা কুরাইশদের সূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে।

চুক্তিনামার এই সূত্র অনুযায়ী আরবের বনু বকর গোত্র কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত হলো আর বনু খুজাআ গোত্র মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হলো। এবং সন্ধির সূত্র অনুযায়ী যদি বনু বকর গোত্র আক্রান্ত হয়, তাহলে কুরাইশরাই আক্রান্ত হয়েছে বলে ধরা হবে আর বনু খুজাআ গোত্র আক্রান্ত হলে মুসলমানরাই আক্রান্ত হয়েছে বলে ধরা হবে। তখন এই চুক্তিনামা বাতিল হয়ে যাবে এবং এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিপক্ষে নিজ গোত্রের সাথে মিলিত হওয়া গোত্রকে যাবতীয় সহায়তা, অস্ত্রশস্ত্র, সরঞ্জাম ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করবে।

সব পক্ষ রাজি হলে চুক্তি হয়ে গেল এবং মুসলমানগণ মদিনায় ফিরে গেলেন। এর দুই বছর পর কুরাইশদের মিত্র গোত্র বনু বকর চুক্তির পরোয়া না করেই মুসলমানদের মিত্র গোত্র বনু খুজাআকে আক্রমণ করল এবং কুরাইশরাও সে আক্রমণে বনু বকরকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করল। আর এভাবেই সর্বপ্রথম কুরাইশ ও তার মিত্র গোত্র চুক্তি ভঙ্গ করল। তখন আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলা চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেন এবং চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তবে যে সকল মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে, তারা তোমাদের সঙ্গে কোনো ত্রুটি

করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে তাদের মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করো।'

এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, পাঁচ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা সকল মুশরিককে হত্যার নির্দেশ দেননি; বরং জালিম বিশ্বাসঘাতক, চুক্তিভঙ্গকারী মুশরিকদেরই হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। তাও আবার সাথে সাথে হত্যার নির্দেশ নয়; বরং নিষিদ্ধ চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন।

যাতে করে এই চার মাসের ভেতর তারা অন্যত্র চলে যেতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধাবস্থায় এমন মানবিকতা অন্য কোনো ধর্ম বা সভ্যতা দেখায়নি। তারপরও নাস্তিকদের মতে মুসলমানগণ অমানবিক! কুরআন অমানবিক গ্রন্থ!

যদি এই আদেশ অমানবিক হয়, তাহলে বাংলাদেশ স্বাধীনতার ঘোষণা, অতঃপর যুদ্ধ এবং এরপর ঐতিহাসিক বিজয়ের ইতিহাসটা কী হবে?

২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালের প্রথম প্রহর। বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করা হলো। শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে বাংলার জনগণকে আহ্বান করা হলো যে, যার যা কিছু আছে তা নিয়েই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার, পাকিস্তানি সৈন্যদের যেখানে পাবে সেখানেই হত্যা করার। আচ্ছা, শেখ মুজিবের এই আহ্বান, এরপর মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যা করেছিলেন, তা কি অমানবিক ছিল না? পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে তো পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সকল জনগণ চুক্তিবদ্ধ ছিল। পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য এবং দেশবিরোধী কর্মকাণ্ড না করার চুক্তি ছিল। তারপরও কেন বাঙালিরা অস্ত্র ধরল?

পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের সেই আহ্বান এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে নির্যাতিত বাঙালিদের অস্ত্র ধারণ যদি অমানবিক না হয়, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে চুক্তিভঙ্গকারী জালিম বিশ্বাসঘাতক কুরাইশদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার আহ্বান কী করে অমানবিক হয়?[৬২]

নাস্তিকদের এই আজিব ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আমাকে ভাবিয়েই যায়!

---

[৬২] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, পৃষ্ঠা নম্বর ১৮৪ খণ্ড নম্বর ০৪, দারুল হাদিস, কায়রো। *সিরাতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম*, ইদরিস কান্ধলভি, পৃষ্ঠা নম্বর ৪১ খণ্ড নম্বর ০২।

- 'আচ্ছা এটা না হয় বাদ দিলাম, নিচের আয়াতগুলো কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?'

'তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে , অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে কোনো একটা বিষয় পছন্দের নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ ভালো জানেন, তোমরা জানো না।' কোরান ২ : ১২৬

'তোমরা যুদ্ধ করো 'আহলে কিতাব'-এর ওই লোকদের (ইহুদি এবং খ্রিষ্টান) সাথে যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ইমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসুল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম ইসলাম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া কর প্রদান করতে বাধ্য থাকে।' কোরান ৯ : ২৯

'আল্লাহ তোমাদের বিপুল পরিমান যুদ্ধলব্ধ সম্পদের (war booty/গনিমতের মাল/নারীসহ অন্যান্য) ওয়াদা করেছেন, যা তোমরা লাভ করবে যুদ্ধে পরাজিত মুশরিকদের কাছ থেকে।' কোরান ৪৮ : ২০

'তোমরা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।' কোরান ৮ : ৩৯

'আল্লাহ ক্রয় করেছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে উৎকৃষ্ট জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর জন্য, এরপর হত্যা করে এবং আহত হয়। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরানের এই প্রতিশ্রুতিতে আল্লাহ অবিচল এবং আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক?' কোরান ৯ : ১১১

'হে নবি, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফেকদের সাথে; তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হলো দোজখ এবং সেটা হলো নিকৃষ্ট ঠিকানা।' কোরান ৯ : ৭৩

'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে রয়েছেন।' কোরান ৯ : ১২৩

জবাব :

ওপরেই বলেছি যে, কুরআনুল কারিম শুধুমাত্র উপাসনার গ্রন্থ নয়, বরং কুরআনুল কারিম বিধানের গ্রন্থও। এই আয়াতগুলো তেমনই। অর্থাৎ এই আয়াতগুলোতে রাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক যুদ্ধের কয়েকটি বিধানমালা বর্ণনা করা হয়েছে। যুদ্ধ কী জিনিস? কেন করতে হবে? করলে লাভ কী হবে? কাদের সাথে করতে হবে? যুদ্ধের সময়সীমা কতক্ষণ হবে? ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি পূর্বেই বলেছি, সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম নেই। জিহাদ আর সন্ত্রাস এক নয়; সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটনের নামই হলো জিহাদ।

যুদ্ধ (জিহাদ) মূলত দুই ধরনের : আক্রমণাত্মক ও প্রতিরোধক।

জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হলো, তাওহিদের প্রচার ঘটিয়ে সমাজকে সংস্কার করা। পৃথিবীতে সাম্য, ইনসাফ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। সকল ধরনের ফেতনা দূর করে সুন্দর সুষ্ঠু একটি সমাজ গড়ে তোলা। যে সকল লোক উন্মত্ত নেশায় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে পরের ভূখণ্ডে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চায়, পৃথিবীর লোকদের গোলাম বানাতে চায়, তাদের প্রতিপত্তিকে চুরমার করে দেওয়াই হলো জিহাদের উদ্দেশ্য। জিহাদের বিধান শুধু ইসলাম ধর্মেই নয়, বরং পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতে—অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্ম ও ইহুদিধর্মে—ও ছিল। যেমন : হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম নমরুদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। মুসা আলাইহিসালাম ফেরআউনের বিরুদ্ধে এবং দাউদ আলাইহিসালাম জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ঈসা আলাইহিসালাম বনি ইসরাইলের অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।[৬৩]

নবিগণ তো শান্তির বার্তাবাহক, তাহলে কেন তাঁরা যুদ্ধ করলেন এবং অনুসারীদেরও যুদ্ধ করতে বললেন?

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে একেকটি এলাকায় একেকটি ধর্মগ্রন্থ দিয়ে একেকজন নবিকে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা সবাই তাঁদের এলাকার মানুষজনকে তাওহিদের শিক্ষা দিয়েছেন। সমাজ থেকে অন্যায়, অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা দূর করে একটি পাপাচারমুক্ত সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা গড়তে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের কর্মক্ষেত্রের সীমানা নির্দিষ্ট ছিল। কেউ এলাকাভিত্তিক, কেউ গোত্রভিত্তিক আর কেউ-বা দেশভিত্তিক কার্যক্রম চালিয়েছেন।

---

[৬৩] *আল-মুহিতুল বুরহানি*, খণ্ড ০৯, পৃষ্ঠা নম্বর ১১৪। *ফাযায়েলে জিহাদ*, সগির বিন ইমদাদ, পৃষ্ঠা নম্বর ১৩।

এই নির্দিষ্ট সীমানার ভেতর কার্যক্রম চালাতে গিয়ে মানুষদের জালিম শাসক পক্ষের গোলামির শিকল থেকে মুক্ত করতে গিয়ে তাঁরা যখনই অত্যাচারী শাসকদের পক্ষ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন, তখন একপর্যায়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইও করেছেন।

পূর্ববর্তী নবিগণ যেভাবে তাঁদের কার্যক্রম চালাতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেভাবে নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন অত্যাচারী কুরাইশদের পক্ষ থেকে। কুরাইশরা সর্বপ্রথম তাঁকে নির্যাতন করা শুরু করে। কখনো পাহাড়ের গিরিখাদে অবরুদ্ধ করে তাঁকে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করে। কখনো পাথর মেরে রক্তাক্ত করে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করে। কখনো তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার চেষ্টা করে। তাঁকে মানসিকভাবে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর সাথীদের মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে উদোম গায়ে উপুড় করে শুইয়ে পাথরচাপা দিয়ে নির্যাতন করে।

আল্লাহ তাআলা এরই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ থেকে এসব অত্যাচার নির্যাতন, বৈষম্য, শিরক ইত্যাদি দূর করার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যুদ্ধের বিধান অবতীর্ণ করেন, যেভাবে পূর্ববর্তী নবিগণের ওপর অবতীর্ণ করেছিলেন। একটি বিশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থার বদলে একটি সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে সমাজ থেকে শিরক, অন্যায়-অত্যাচার, বৈষম্য ও পাপাচার দূরীকরণের পদ্ধতির নামই হলো জিহাদ।[৬৪]

কোনো সুস্থ মানুষই জিহাদের বিরোধিতা করতে পারে না। কোনো সুস্থ মানুষই চায় না সমাজব্যবস্থায় অন্যায়-অত্যাচার, বৈষম্য ও পাপাচার থাকুক। যারা চায়, তারা এসব নাস্তিকের মতোই অসুস্থ। যারা চায়, তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী। ১৯৭১ সালে যে সকল মুক্তিযোদ্ধাগণ বাঙলার জমিন থেকে অন্যায়-অত্যাচার দূর করার জন্য, অত্যাচারী পাকিস্তানি শাসকদের নিপীড়ন থেকে বাঙলার মানুষকে মুক্ত করার জন্য জীবন দিয়েছিলেন, তারা সেই মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধী। (যদিও তা জিহাদ ছিল না; কিন্তু হাফেজ্জি হুজুরের ভাষায় তা ছিল জালিমের বিরুদ্ধে মাজলুমের সশস্ত্র সংগ্রাম।) তারাই তো স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি।

---

[৬৪] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, পৃষ্ঠা নম্বর ৭১, ১৪৩ ও ১৭৯ খণ্ড নম্বর ০৩।

আসিফ মহিউদ্দীন

'আচ্ছা এটা না হয় বাদ দিলাম, নিচের আয়াতগুলো কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?'

'তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়।' কোরান ৪৮ : ১৬

'আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেবো, কাজেই তাদের গর্দানের ওপর আঘাত হানো এবং তাদের কাটো জোড়ায় জোড়ায়।' কোরান ৮ : ১২

'সুতরাং তোমরা তাদের (কাফেরদের) হত্যা করোনি, বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন। আর তুমি মাটির মুষ্টি নিক্ষেপ করোনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং, যেন ঈমানদারদের প্রতি এহসান করতে পারেন যথার্থভাবে।' কোরান ৮ : ১৭

জবাব :

৪৮ নম্বর সুরার ১৬ নম্বর আয়াতের পুরোটা নিয়ে আসলে আপনারা কিছুটা বুঝতেন যে, আয়াতটা কাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তিনি তা না করে আয়াতের শেষ অংশটা নিয়ে এসেছেন। কারণ, পুরোটা নিয়ে আসলে তার কথা টিকত না যে!

আয়াতটির পূর্ণরূপ—'গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদের বলে দিন, আগামীতে তোমরা এক প্রবল শক্তিশালী জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহূত হবে। তোমরা তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন করো, তবে আল্লাহ তোমাদের উত্তম পুরষ্কার দেবেন। আর যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো, তবে তিনি তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।'[৬৫]

আমরা দেখতে পেলাম এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট একটি দল—অর্থাৎ মরুভূমিতে অবস্থানকারী কিছু মানুষ—কে সম্বোধন করেছেন এবং আয়াতের শেষে তাদের এই বলে হুশিয়ারিও দিয়েছেন যে, পূর্বেও তোমরা একবার পালিয়ে গেছ, সামনেও যদি পালিয়ে যাও তাহলে তোমাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সেই মরুবাসীগণ কারা? কাদের সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে?

---

[৬৫] *তাফসিরে ইবনে কাসির*, উক্ত আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য। *মাআরেফুল কুরআন*, উক্ত আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।

ওপরে এক জায়গায় হুদাইবিয়ার ঘটনা সংক্ষেপে বলেছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা থেকে মক্কায় ওমরা করতে এসে হুদাইবিয়া নামক স্থানে অবস্থান করেন এবং তাঁর জামাতা হজরত উসমান রা.-কে প্রতিনিধি হিসেবে মক্কার মুশরিক নেতৃবৃন্দের কাছে প্রেরণ করেন। মক্কার সাধারণ নেতৃবৃন্দ হজরত উসমান রা.-কে গ্রেফতার করে উচ্চপদস্থ নেতৃবৃন্দের কাছে নিয়ে যায়। হজরত উসমান রা.-এর গ্রেফতারের খবর রাসুলের কাছেও পৌঁছায়। আবার অনেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বলেও সংবাদ দেয় যে, মক্কার লোকেরা হজরত উসমানকে শহিদ করে দিয়েছে। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন।

তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুদাইবিয়ার এই অভিযানে বের হন তখন মরুভূমিতে অবস্থানকারী লোকদেরকেও তাঁর সাথে যোগ দিতে আহ্বান করেন। মরুবাসী লোকেরা তখন নানান বাহানায় রাসুলের সাথে যোগ দিতে রাজি হয়নি। আর কেউ কেউ যোগ দিয়েও পরে পিছু হটে যায়।

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় ফিরে যান। এবং এর পরবর্তী বছর খাইবার অভিযানের প্রস্তুতি নেন। তখন পিছু হটা সেসব মরুবাসী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে খাইবারে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দেন যে, না, খাইবারে শুধু তাঁরাই অংশ গ্রহণ করতে পারবে, যারা হুদাইবিয়াতে অংশগ্রহণ করেছিল। হুদাইবিয়াতে পিছু হটে যাওয়া সেইসব মরুবাসী খাইবারে অংশগ্রহণ করতে পারবে না; বরং সামনেও প্রবল শক্তিশালী একটি জাতির সাথে যুদ্ধ হবে। তারা যেন তখন সে যুদ্ধতে অংশ গ্রহণ করে।

তো এই আয়াতটা অমানবিক হল কীভাবে?

ধরুন, এখন বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের আবারও নতুন করে যুদ্ধ বাধল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে সেনাবাহিনীর সকল সদস্য সেনাপ্রধানের কাছে আবেদন করল। সেনাপ্রধান বললেন, পাকিস্তানের সাথে আমাদের যুদ্ধটা ছোটখাটো। এই যুদ্ধে সেনাবাহিনীর সকল সদস্যের অংশগ্রহণের প্রয়োজন নেই, বরং এই যুদ্ধে ১৯৭১-এ স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যগণ অংশ গ্রহণ করবে। আর সামনেও প্রবল শক্তিশালী ভারতের সাথে আমাদের যুদ্ধ বাধবে। সেই যুদ্ধে যেন সেনাবাহিনীর সকল সদস্য অংশগ্রহণ করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্য আত্মসমর্পণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত যেন যুদ্ধ অব্যাহত রাখা হয়।

সেনাপ্রধানের এই ঘোষণাটা কি অমানবিক হবে? যদি অমানবিক হয় তাহলে সেনাবাহিনীরই-বা আর প্রয়োজন কী? সেনাবাহিনী গঠন করা হয়েছে তো পররাষ্ট্রের আগ্রাসন থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য।

যদি সেনাপ্রধানের এই ঘোষণাটি অমানবিক হয়, তাহলে নাস্তিকদের উচিত অমানবিকতার দোহাই দিয়ে সরকারপ্রধানের কাছে সেনাবাহিনীকে বিলুপ্ত করার আবেদন জানানো। আর যদি তা মানবিক হয়, তাহলে উক্ত আয়াতের বেলায় কেন এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড?

৮ নম্বর সুরার ১২ ও ১৭ নম্বর আয়াত :

এই দুটি আয়াত বদরের যুদ্ধ সম্পর্কীয়। প্রথম আয়াত বদর যুদ্ধে মুসলমানদের মনোবল বাড়ানোর জন্য এবং দ্বিতীয় আয়াত বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের কারণ বর্ণনা করে অবতীর্ণ হয়। মুসলমানদের ওপর মক্কার কাফিরদের নির্যাতনের কথা পূর্বেও সংক্ষেপে বলেছি। কাফিরদের চরম অত্যাচারের কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় মদিনায় হিজরত করলেন আল্লাহ তাআলার নির্দেশে। মদিনায় যাওয়ার পরও কাফিররা সব সময় মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার হুমকি দিত। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীরা এক পর্যায়ে রাতে ঘুমাবার সময়ও অস্ত্র সাথে নিয়ে ঘুমাতেন। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের অনুমতি পেয়ে সামরিক প্রস্তুতি শুরু করলেন। এবং সামরিক মিশনের অংশ হিসেবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলার পথরোধ করার উদ্দেশ্যে তিন শ তেরো জন সাথি নিয়ে মদিনা থেকে বের হলেন।

এ দিকে কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলার নেতার কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যায় যে, মুসলমানগণ তার পথরোধ করার জন্য মদিনা থেকে বের হয়েছে। ফলে তিনি রাস্তা পরিবর্তন করে অন্য রাস্তায় মক্কার পথ ধরেন এবং সাহায্য প্রার্থনা করে দ্রুত একজন সংবাদ-বাহককে মক্কায় প্রেরণ করেন। কুরাইশরা বাহকের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলার সাহায্যার্থে এক হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়। আবার ওদিকে বাণিজ্যিক কাফেলাও নিরাপদে মক্কায় পৌঁছায়। বাণিজ্যিক কাফেলার নেতা তার সাহায্যে এগিয়ে আসা এক হাজার সৈন্যকে পুনরায় মক্কায় ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কুরাইশদের শীর্ষ নেতা আবু

জাহেল মক্কায় ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানায় এবং মুসলমানদের হত্যার উদ্দেশ্য সামনে এগিয়ে যেতে থাকে।

এ দিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে বদর নামক স্থানে থেমে যান। এরপর কুরাইশরা বদরে পৌঁছলে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়ে তুমুলযুদ্ধ করে। যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয়ী হন এবং কুরাইশরা পরাজিত হয়।

ইতিহাসবিদগণ আজও এই যুদ্ধের ঘটনা পড়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যান। কারণ, এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিজিত হওয়ার বাহ্যিক কোনো কারণ-উপকরণ ছিল না। মুসলমানগণের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন শ তের। আবার এই স্বল্প সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের অধিকাংশের কাছেই কোনো ধরনের যুদ্ধাস্ত্র ছিল না। আর অন্যদিকে কুরাইশরা ছিল এক হাজারের অধিক এবং সবার কাছে ছিল উন্নতমানের যুদ্ধাস্ত্র।[৬৬]

উক্ত সুরার ১২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা সে কথার দিকে ইঙ্গিত করে মুসলামনদের মনোবল বাড়াতে গিয়ে বলেন, 'তোমরা সংখ্যায় কম ও দুর্বল হলেও ভয় পেয়ো না। আমি কাফিরদের মনে তোমাদের ব্যাপারে ভীতি সঞ্চার করে দেবো। ফলে তোমরা জমে লড়াই করো।'

আর ১৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের কারণ বলতে গিয়ে বলেন, 'মূলত তোমরা যুদ্ধ করোনি, বরং আল্লাহ তাআলাই করেছেন।'

অর্থাৎ এই যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। ফেরেশতাগণের মাধ্যমে তোমাদের সাহায্য করেছেন। তোমাদের সংখ্যা কাফিরদের চোখে দ্বিগুণ দেখিয়েছেন। কাফিরদের মনে তোমাদের ব্যাপারে ভীতি সঞ্চার করেছেন।

আস্তিক

'কিন্তু ওই আয়াতে (৯/৫) তো নিষিদ্ধ মাস, মানে রমজান মাসে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে যারা রমজান মাসে হত্যা করছে, তারা তো সহি ইসলাম পালন করছে না, তাই না?'*

---

[৬৬] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খণ্ড নম্বর ৩, পৃষ্ঠা নম্বর ২৫৯-২৬০ *তাফসিরে মাযহারি*, উক্ত আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।

আসিফ মহিউদ্দীন

'অর্থাৎ জঙ্গিদের তাহলে খুনোখুনি করার জন্য রমজান শেষ হওয়ার অপেক্ষা করা উচিত ছিল, তাহলে সেটা আপনার মতে সহি ইসলামিক হত্যা হতো, তাই তো? কিন্তু একটু আগেই না বললেন, ইসলাম এসব খুনোখুনির অনুমতিই দেয় না!'

আস্তিক

'আপনি বিষয়টা বুঝছেন না। আল্লাহ পাক কোরানে বলেছেন, তিনি অবিশ্বাসীদের অন্তরে সিলমোহর মেরে দিয়েছেন। তাই আপনি বুঝতে পারছেন না।'

আসিফ মহিদ্দীন

'তাহলে সেটার জন্য আমি কীভাবে দায়ি? আল্লাহই যদি আমার অন্তর সিলগালা করে দিয়ে থাকেন, তার কারণে আমি যদি ইসলামের শান্তিময়তা বুঝতে না পারি, তার জন্য আমাকে নরকে পাঠানো কি তার উচিত হবে? ধরুন, আমি আপনার হাত-পা বেঁধে দৌড়াতে বললাম। না দৌড়ালে আপনাকে খুন করা হবে বলেও হুমকি দিলাম। আপনি কি দৌড়াতে পারবেন? আপনি না দৌড়ালে আপনাকে যদি আমি খুন করি, সেই খুনের দায় আপনার না আমার? আমি কি বলব, সেই খুনের দায় আপনার? কারণ আপনি হাত পা বাঁধা অবস্থায় দৌড়ান নি?'

জবাব :

আফসোস! এইসব মূর্খ নাস্তিকরাই কুরআন মানবিক নাকি অমানবিক—তা বিচারের ঠিকাদারি নিয়ে ফেলছে। যে বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কথা বলা চরম মূর্খতা।

ওপরে আসিফ মহিউদ্দীন আস্তিক বেশে এবং নিচে তার উত্তরেও বলেছে, নিষিদ্ধ মাস—অর্থাৎ যে মাসে আল্লাহ তাআলা যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন—সে মাস নাকি রমজান মাস!

মূলত নিষিদ্ধ মাস হলো চারটি : জিলকদ, জিলহজ, মুহাররাম, রজব। এই চারটি মাসে আল্লাহ তাআলা যুদ্ধ নিষিদ্ধ করেছিলেন। তবে সব ধরনের যুদ্ধ নয়; প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ এই চার মাসে নিষিদ্ধ করা হয়নি।

আর ইসলামিক স্কলারগণের মতে, ইসলামের শুরুর দিকে এই চার মাসে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। তবে বর্তমানে সেই নিষেধাজ্ঞা বাকি নেই।[৬৭]

এরপর সে শেষে বলল, যদি আল্লাহ তাআলা তার অন্তর সিলগালা করে দিয়েই থাকেন, তাহলে তার জন্য সে কীভায়ে দায়ি হয়?

এই কথাটি তো তার নয়; এই কথাটি মক্কার মুশরিকদের ছিল। পূর্বপুরুষদের সাথে কী আশ্চর্যজনক মিল!

মক্কার কাফিররা নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করে বলত, 'আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন এমন প্রশ্ন করব, যেগুলোর উত্তর দেওয়া অসম্ভব। এরপর তাকে বলব, যদি আপনি উত্তর দিতে পারেন তাহলে আমরা মুসলিম হয়ে যাব। মুহাম্মাদ তো আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না। তারপরও যদি উত্তর দিয়ে দেন, তাহলেও আমরা মুসলমান হব না।'

এভাবে মক্কার কাফিররা আগ থেকেই সুস্পষ্ট সত্যকে অস্বীকার করার শপথ নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে গিয়ে আজিব আজিব প্রশ্ন করত। যেমন : মুষ্টিবদ্ধ হাতে পাথর রেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করত তাদের মুষ্টির ভেতর কী? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, তোমাদের হাতের জিনিসই বলুক সে কী। তারপর অলৌকিকভাবে সে পাথর কথা বলে উঠত।

তখন কাফিররা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাদুকর আখ্যায়িত করে কথা না রেখে, ইসলাম গ্রহণ না করেই চলে যেত। অন্তর সিলগালার এই আয়াত সে সকল ভণ্ডদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যারা পূর্ব থেকেই শপথ নিয়ে রাখে ইসলামের সত্যতা দিবালোকের মত স্পষ্ট হলেও কস্মিণকালে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে না। নিজের অন্তরকে সিলগালা করার কারণ তো তারা নিজেরাই।

যেমন : তামাক বা সিগারেটের প্যাকেটে একটি কথা লেখা থাকে যে, 'তামাক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।' আর আমরা জানি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর মানে হলো, তামাকের কারণে স্বাস্থ্য ক্যান্সারের ঝুঁকিতে থাকে। এখন যদি কোনো সুস্থ মানুষ এ বিষয়ে সত্য জানার পরও তামাক খায়, তারপর তামাক সেবনের কারণে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে দোষ কার হবে? তামাকের নাকি জেনেশুনে তামাক সেবনকারীর?

---

[৬৭] *আসবাবুন নুজুল*, পৃষ্ঠা নম্বর ১২। *তাফসিরে ইবনে কাসির*, উক্ত আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।

---

* (উক্ত ডায়লগ দেওয়ার আগে আসিফ মহিউদ্দীন বোল পাল্টে কুরআনিক আলোচনার মধ্যখানে কয়েকটি হাদিস নিয়ে এলো। যে হাদিসগুলোতে জিহাদের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

জিহাদের ব্যাপারে ওপরে বলেছি, তাই হাদিসগুলো মূলে রাখলাম না। তবে নমুনাস্বরূপ তার উল্লেখিত দু হাদিস—সহিহ বুখারি : ৪/৫২, ৪৪ : 'আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন, একজন মানুষ এসে রসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করল, "জিহাদের সমান মানের একটি জিনিসের নাম বলুন।" আল্লাহর রাসুল বললেন, "আমি এমন কিছুর নাম জানি না।" আবু হুরায়রা আরও বলেন, "মুজাহিদের (আল্লাহর নামে যারা যুদ্ধ করে) ঘোড়ার ক্ষুরের প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহ পুরস্কৃত করেন।"'

সহিহ বুখারি : ১১৪৭, খন্ড ৫, পৃ. ৫৩৫ : 'আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে শরিক হয়ে কেউ জখমী হয় না; বরং আল্লাহ ভালো করেই জানেন, কে জখমী হয়েছে; কিয়ামাত-এর সময় সে এমন অবস্থায় স্বীয় কবর থেকে গাত্রোত্থান করবে যে, তার রং হবে খুনের রঙে রঞ্জিত এবং তার থেকে প্রবাহিত হবে মিশক আম্বরের সুবাস।') *[-লেখক]*

সংশয়বাদ

'কুরআনের ওপর আপত্তিকারীদের আরেকটি কথা হলো, 'কুরআনের নসখ অনেক বেশি। যদি কুরআন আল্লাহ তাআলারই গ্রন্থ হতো তাহলে তো তাতে কোনো ধরনের পরিবর্তন-পরিমার্জন পরিলক্ষিত হওয়ার কথা নয়। কারণ, প্রভু তিনি হতে পারেন না, যিনি প্রথমে একটি বিধান অবতীর্ণ করেন এবং কিছুদিন পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে আরেকটি নতুন বিধান অবতীর্ণ করেন!'

মূলত এই আপত্তিকারীগণ নসখ এবং বাদা'র মধ্যকার পার্থক্যটি জানে না। অথচ উভয়টির মধ্যে অনেক বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বাদা তাকে বলে, যা প্রথম থেকে জ্ঞানে থাকে না। আর এটাই প্রভুত্বের শানের বিপরীত। পক্ষান্তরে নসখ বলে, যা পূর্ব থেকে জ্ঞানে থাকে। যেমন : একজন ডাক্তার তার রোগীর শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী প্রথমে কিছু ঔষধ দেন। এবং কিছুদিন পর রোগীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে পূর্বের ঔষধ পাল্টিয়ে নতুন কিছু দেন। এই কারণে ডাক্তারকে মূর্খ বলা যাবে না। কারণ, তিনি তা করেন রোগীর শারীরিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে। নসখের বিষয়টি এমনই।'[৬৮]

---

[৬৮] আমীরে হেফাজত আল্লামা শাহ আহমদ শফী দা. বা., *আল-খাইরুল কাসির* : ১৯ নম্বর পৃষ্ঠা।

সংশয়বাদ[৬৯]

শাহিনুর রহমান শাহিন

এক :

'কোরান বিশ্লেষণের সময় 'নসখ' নামের একটি আরবি শব্দ ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ হলো, যা রহিত করে। নসখ-এর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে 'মানসুখ' শব্দটি। মানসুখ অর্থ, যা রহিত করা হয়েছে। কোরানের কিছু আয়াতকে মানসুখ আয়াত এবং আরও কিছু আয়াতকে নসখ আয়াত বলা হয়। নসখ আয়াতের বিধান দ্বারা মানসুখ আয়াতের বিধান রহিত ও প্রতিস্থাপিত হয়। কোরান যে মানুষের রচিত একটি গ্রন্থ, নসখ-মানসুখের বিষয়টি হচ্ছে এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

নবি মুহাম্মদের কাছে অহি হিসেবে কিছু কিছু করে আয়াত এসেছে। বেশিরভাগ আয়াত এসেছে তাৎক্ষণিক কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য। যেমন ধরুন : একজন এসে বলল, যুদ্ধে বন্দি হওয়া সধবা নারীদের সাথে সেক্স করা যাবে কি না। কিছু সময়ের মধ্যে এই বিষয়ে নবি মুহাম্মদের কাছে অহি পাঠানো হলো। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, "নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতিত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ.....।"

এই আয়াতের মানে হলো, যুদ্ধবন্দি নারীগণ যেহেতু দাসী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু তারা সেক্স করার জন্য বৈধ! এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি আমি মোটেও বানিয়ে বলছি না।

স্বয়ং কোরানের মধ্যে এভাবে নসখ-মানসুখের ব্যাপারটিকে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, "আমি কোনো আয়াতকে রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত করলে পরিবর্তে এর চেয়ে ভালো বা এর অনুরূপ আয়াত অবতীর্ণ করি। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ সব বিষয়ের ওপরই ক্ষমতাবান?"

---

[৬৯] সংশয়বাদ পোস্টের লিংক : https://www.nastikya.com/archives/৯৪৫।

কী চমৎকার একটি কথা! এখন আপনিই বলুন, এ রকম নসখ-মানসুখ আয়াত দ্বারা পরিপূর্ণ কোরানকে কোন যুক্তিতে ঐশ্বরিক গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়? আমাদের কি সেই সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন আছে, যিনি বারবার ভুল বিধান অনুসরণ করতে বলেন! ভুল সংশোধন করে আবার নতুন বিধান পাঠান, যেটি নিজেও এখন অগ্রহণযোগ্য! *সুরা নিসা : ২৪ নম্বর আয়াত এবং তাফসিরে ইবনে কাসির : ২য় খণ্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা। সুনানে নাসায়ি : ৩৩৩৪ নম্বর হাদিস এবং সুনানে আবু দাউদ : ২১৫২ নম্বর হাদিস। সুরা বাকারা : ১০৬ নম্বর আয়াত; সুরা নাহল : ১০১ নম্বর আয়াত এবং সুরা হজ : ৫২-৫৩ নম্বর আয়াত।'*

উত্তর :

'নসখ'-এর আভিধানিক অর্থ হলো, মিটিয়ে দেওয়া। আর পারিভাষিক অর্থ হলো, কোনো এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে, বিশেষ সময়ে আল্লাহ তাআলা একটি হুকুম অবতীর্ণ করেন। এরপর যখন সে সময় অতিবাহিত হয়ে যায় কিংবা প্রেক্ষাপট পাল্টে যায়, তখন আল্লাহ তাআলা নতুন প্রেক্ষাপট-পরিস্থিতি অনুযায়ী পূর্ব থেকেই তাঁর জ্ঞানে থাকা আরেকটি হুকুম অবতীর্ণ করেন। যার কারণে পূর্বের হুকুমটি রহিত হয়ে যায়। আর এটাকেই পরিভাষায় 'নসখ' বলে। **'যা রহিত করে'** তাকে নসখ বলে না, বরং তাকে নাসিখ বলে। এবং যা রহিত হয় তাকে মানসুখ বলে। **'নসখ এর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে মানসুখ শব্দটি'** নয়, বরং নাসিখ-মানসুখ উভয়ের সমষ্টিকে নসখ বলে।

খুব মজার বিষয়! এই জ্ঞান নিয়ে কুরআনের সংশয়বাদ প্রমাণ করতে এসেছে! মজা শেষ হয়নি; আরও আছে, আর তা হলো, তিনি নসখকে যেভাবে 'ভুলে'র সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করে প্রশ্ন তুলেছেন যে, **'আমাদের কি সেই সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন আছে, যিনি বারবার ভুল বিধান অনুসরণ করতে বলেন!'** ঠিক একই প্রশ্ন ইহুদিরাও তাদের মূর্খতার দরুন করেছিল। নাস্তিকদের আমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের এজেন্ট বললেই তারা চেতে ওঠে। এমনিতে কি আর বলি? কাজকর্মেই তো তারা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অনুসরণ করছে!

নসখ কাকে বলে?

নসখ'র অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তাআলা কোনো একটি হুকুমকে উপযুক্ত মনে করে অবতীর্ণ করলেন এবং পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে (মাআজাল্লাহ) আরেকটি হুকুম অবতীর্ণ করলেন। এটাকে নসখ বলে না, বরং এটাকে বাদা বলে।

পূর্বেই বলেছি নসখের অর্থ হলো, কোনো এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে, বিশেষ সময়ে একটি হুকুম অবতীর্ণ করা। এরপর যখন যুগ পাল্টে যায়, তখন নাসিখ (নতুন বিধান) আসে। নাসিখ এসে মানসুখকে ভুল সাব্যস্ত করে না। কারণ, নাসিখের কাজ হলো পূর্ববর্তী বিধানের (তথা মানসুখের) কার্যকারিতার সময়কে নির্দিষ্ট করে দেওয়া। অর্থাৎ পূর্বে যুগের পরিস্থিতির কারণে মানসুখ বিধানটি ঠিকই ছিল, কিন্তু যেহেতু সে পরিস্থিতি শেষ হয়ে গেছে, তাই নতুন হুকুম (নাসিখ) এসেছে। আর এই নাসিখ-মানসুখ বিধান আল্লাহ তাআলার জ্ঞানে পূর্ব থেকেই থাকে, কিন্তু যুগের পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি একটির পর অন্যটিকে অবতীর্ণ করেন।[১০]

যেমন : আমরা জানি যে, শিশুকে জন্মের পরবর্তী ছয় মাস মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হয়। এরপর মায়ের বুকের দুধের সাথে অন্যান্য লিকুইড-জাতীয় জিনিসও খাওয়ানো হয়। এরপর যখন তার বয়স এক বছরের কাছাকাছি হয়, তখন তাকে লিকুইড-জাতীয় খাবার ব্যতীত অন্যান্য খাবার; যেমন : ভাত এবং অন্যান্য খাবার খাওয়া শেখানো হয়। আর এ রকম স্টেপ বাই স্টেপ একটির পর অন্যটি খাওয়ানো হয় তার বয়সজনিত বিশেষ পরিস্থিতির কারণে। আমাদের দেশের কার্লচার অনুযায়ী শিশুকে যে ভাতে অভ্যস্ত করতে হবে, তা আমরা পূর্ব থেকেই জানি। কিন্তু জন্মের পরপরই তাকে ভাত খাওয়াই না তার বয়সজনিত বিশেষ পরিস্থিতির কারণে।

বরং তার বয়সের পরিস্থিতির অনুকূলে প্রথমে মায়ের বুকের দুধ, এরপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর ভাত খাওয়া শিখিয়ে থাকি। এর মানে এ নয় যে, জন্মের পরবর্তী ছয় মাসে তাকে ভাত না খাইয়ে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো ভুল ছিল।

নসখের বিধানটি এমনই। পরবর্তী বিধানের কারণে পূর্ববর্তী বিধান ভুল সাব্যস্ত হয়নি, বরং পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী একটির পর অন্যটি অবতীর্ণ হয়েছিল। আর এ রকম নসখ যে শুধু ইসলাম ধর্মেই ছিল তা নয়, বরং ইহুদি এবং খ্রিষ্টান ধর্মেও নসখ ছিল।

যেমন : হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর সময় আপন দুই বোন এক স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ ছিল। এমনকি স্বয়ং হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর দুই স্ত্রী পরস্পর আপন বোন ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে হজরত মুসা

---

[১০] *আল-ইতকান*, খণ্ড নম্বর ০৩, পৃষ্ঠা নম্বর ৫৩ থেকে ৫৫ *উলুমুল কুরআন*, পৃষ্ঠা নম্বর ১৫৯-১৬০ *আল-খাইরুল কাসির*, আল্লামা আহমদ শফী দা.বা., পৃষ্ঠা নম্বর ১৩।

আলাইহিস সালাম-এর যুগে আপন দুই বোন এক স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়।

এভাবে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর যুগে স্ত্রীকে সাধারণভাবে তালাক দেওয়া বৈধ ছিল; কিন্তু হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর যুগে স্ত্রীকে একমাত্র পরকীয় দৈহিক সম্পর্কের (জিনা) জেরে তালাক দেওয়া বৈধ রেখে সাধারণভাবে তালাক দেওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়।[৭১]

তাই যে সকল লোক বাস্তবতাকে অস্বীকার করে মিথ্যাচারস্বরূপ 'নসখ'কে আল্লাহ তাআলার ভুল বলে ইসলামধর্মকে পচাতে চায়, নিঃসন্দেহে বুঝে নিবেন, সে নাস্তিক নয়; একমাত্র ইসলাম-বিদ্বেষী, বিদেশী শয়তানদের পা-চাটা বেতনভোগী দেশীয় এজেন্ট।

সুরা নিসার ২৪ নম্বর আয়াত :

সুরা নিসার ২২ এবং ২৩ নম্বর আয়াতে কোন কোন নারীকে বিবাহ করা যাবে না, তার বর্ণনা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। যেমন : সৎ মা, সৎ দাদী, আপন মা, বোন, মেয়ে, খালা-ফুফু ইত্যাদি। আর সেই নিষিদ্ধতার সাথে মিলিয়ে ২৪ নম্বর আয়াতে এসে এটা বলেছেন, যে সকল নারীদের স্বামী বর্তমান (সধবা নারী), তাদেরও বিবাহ করা যাবে না। তবে যুদ্ধ-বন্দিনী নারীদের বিবাহ করা যাবে।

এখন এখানে তার মিথ্যাচারের নমুনাটা দেখুন—

সে বলল, **'একজন এসে বলল, যুদ্ধে বন্দি হওয়া সধবা নারীদের সাথে সেক্স করা যাবে কি না। কিছু সময়ের মধ্যে এই বিষয়ে নবি মুহাম্মদের কাছে অহি পাঠানো হলো।'**

প্রথমত : এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন, তা খাইবার যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। আর কেউ বলেন, তা হুনাইন যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। আর কেউ বলেন, কিছু বিধর্মী নারী তাদের কাফির স্বামীদের ত্যাগ করে মুসলিম হয়েছিলেন। কিন্তু সেই কাফির স্বামীরা তাদের তালাক দেয়নি। সেই নারীদের সম্পর্কে যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

---

[৭১] *উলুমুল কুরআন*, পৃষ্ঠা নম্বর ১৬১।

দ্বিতীয়ত : সে আয়াতটি এখানে এমনভাবে উপস্থাপনা করেছে যে, মনে হচ্ছে যুদ্ধবন্দিনী নারীদের সাথে শুধু সেক্সকে বৈধ করার জন্যই উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু উক্ত আয়াতসহ তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আয়াতগুলো লক্ষ করে দেখুন, সেগুলোতে বিবাহের আলোচনা করা হয়েছে।

তাই যারা বলেন যে, উক্ত আয়াতটি সে সকল নারীর বিবাহ করার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল, যারা নিজের কাফির স্বামীদের ত্যাগ করে মুসলমানদের কাছে চলে এসেছিলেন। সে উক্তিটিই গ্রহণযোগ্যতার সবচে কাছে।

তৃতীয়ত : উক্ত আয়াতের শেষ অংশটি দেখুন। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের হুশিয়ার করে বলেছেন, 'তোমরা নারীদের তালাশ করো, মহরের মাধ্যমে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্য; কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থের উদ্দেশ্যে নয়।' যদি উক্ত আয়াত শুধুমাত্র সেক্সকে বৈধ করার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হতো, তাহলে এই হুশিয়ারি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কি?[৭২]

সূত্র পর্যালোনা :

০১) সুরা নিসা : ২৪ নম্বর আয়াত এবং *তাফসিরে ইবনে কাসির* : ২য় খণ্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা।
-*ইবনে কাসিরে* উক্ত আয়াতের তাফসির বর্ণিত।
০২) *সুনানে নাসায়ি* : ৩৩৩৪ নম্বর হাদিস এবং *সুনানে আবু দাউদ* : ২১৫২ নম্বর হাদিস।
-উভয় হাদীসে যুদ্ধবন্দিনী নারী সম্পর্কিত আয়াতটি (ওয়াল মুহসানাতু মিনান নিসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম..) অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখ আছে।

দুই :

'এভাবে আল্লাহ পাক নবি মুহাম্মদের মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান করেছেন। ভালো কথা। কিন্তু সমস্যা হলো, একটি বিষয়ে তিনি আয়াত পাঠানোর কিছুদিন পরে অন্য আয়াত পাঠিয়ে আগের আয়াতকে বাতিল করে দিয়েছেন। ব্যাপারটা সহজ করে বলতে পারছি না। একটি উদাহরণ দিই।

সদ্যবিধবা নারীদের সম্পর্কে নবি মুহাম্মদের কাছে একবার আয়াত পাঠানো হলো যে, তারা পূর্ণ একবছর স্বামীগৃহে অবস্থান করে ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দতের সময়ে তাদের জন্য বিবাহ করা নিষিদ্ধ। এই এক বছর ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ যেন স্বামী তাদের অসিয়ত করে যায়।

---

[৭২] *আসবাবুন নুজুল*, পৃষ্ঠা নম্বর ৫০। *তাফসিরে তাবারি*, উক্ত আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য।

পরবর্তীতে এই আয়াত বাদ দিয়ে নতুন আয়াত পাঠানো হলো, হাদিস বর্ণনা করা হলো। সেখানে বলা হলো, এক বছর ইদ্দত পালনের দরকার নেই, চার মাস দশ দিন করলেই হবে। আগে শুধু স্বামীগৃহে থেকে ইদ্দত পূরণ করতে হতো। নতুন বিধান অনুসারে, যেখানে খুশি থাকতে পারবে, স্বামীগৃহে কিংবা স্বামীগৃহের বাইরে। এক্ষেত্রে আগের আয়াতকে আমরা মানসুখ ও নতুন আয়াতকে নসখ আয়াত হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। *সুরা বাকারা : ২৪০ ও ২৩৪ নম্বর আয়াত এবং তাফসিরে ইবনে কাসির : ১ম খণ্ড, ৬৮০-৮১ পৃষ্ঠা। সহিহ বুখারি : ৪১৭৪, ৪১৮০ ও ৪২২৩ নম্বর হাদিস; সুনানে নাসায়ি : ৩৫৩২ ও ৩৫৪৪-৪৫ নম্বর হাদিস এবং সুনানে আবু দাউদ : ২২৯২ নম্বর হাদিস।'*

উত্তর

এসব নাস্তিক গলা ফাটিয়ে নারী স্বাধীনতার আওয়াজ তোলে। নারী স্বাধীনতার জন্য ইসলামকে প্রতিবন্ধক হিসেবে চালিয়ে দিতে কতই না চেষ্টা করে। মূলত তারাই নারীর স্বাধীনতা চায় না। নারীর মর্যাদার কদর করতে জানে না। ইসলাম যখনই নারীর পক্ষে কথা বলে, তারা তখন তা বিকৃতরূপে উপস্থাপন করে।

জাহেলি যুগে কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে, সে নারী স্বামীর সম্পত্তিতে কোন অংশ পেত না। এবং মৃত স্বামীর জন্য স্ত্রীকে এক বছর শোক পালন করতে হত। আর এই একবছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সেই স্ত্রী অন্য কোনো লোককে বিবাহ করতে পারত না।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে এক বছরের শোক পালন বহাল রাখা হলেও নারীদের ওপর অনুগ্রহপূর্বক আল্লাহ তাআলা এটাও বলে দিলেন যে, নারীদের স্বামীর সম্পত্তিতে অংশ দেওয়ার জন্য স্বামীরা যেন পূর্ব থেকে অসিয়ত করে যায়। এরপর আল্লাহ তাআলা নারীদের ওপর আবার অনুগ্রহ পূর্বক পূর্বের আয়াতকে রহিত করে হুকুম দিলেন যে, জাহেলি যুগের মতো মৃত স্বামীর জন্য এক বছর শোক পালন করতে হবে না, বরং চার মাস দশ দিন পালন করলেই হবে। এবং সাথে মিরাসের আয়াত অবতীর্ণ করে স্ত্রীকে মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে একটি নির্দিষ্ট অংশ দেয়ারও হুকুম দিলেন।

এই বিধানটি তো নারীদের স্বাধীনতার জন্যইগ, নারীর কষ্ট লাঘব করার জন্যই। মূর্খরা স্ব-ইচ্ছায় অন্ধ হলে আমাদের কী করার আছে?[৭৩]

---

[৭৩] *মাআরেফুল কুরআন*, তাফসির দ্রষ্টব্য। *আসবাবুন নুজুল*, পৃষ্ঠা নম্বর ৩৫।

সূত্র পর্যালোচনা :
০১) সুরা বাকারা : ২৪০ ও ২৩৪ নম্বর আয়াত এবং তাফসিরে ইবনে কাসির : ১ম খণ্ড, ৬৮০-৮১ পৃষ্ঠা।
-উক্ত আয়াতের তাফসির বর্ণিত।
০২) সহিহ বুখারি : ৪১৭৪, ৪১৮০ ও ৪২২৩ নম্বর হাদিস।
-প্রথম দুটি হাদিস নসখ সম্পর্কে হজরত উসমান রা. এর একটি উক্তি বর্ণিত। এই হাদিসগুলো দ্বারাই বোঝা যায়, হজরত উসমান রা. কুরআনের অনুলিপি করতে কত সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন।
যেমন ৪১৮০ নম্বর হাদীসটি : আবদুল্লাহ ইবনে আবুল আসওয়াদ রাহি. ইবনে আবি মুলাইকা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইবনে যুবায়ের রাযি. বললেন, আমি উসমান রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, সুরা বাকারার এ আয়াতটিকে তো অন্য একটি আয়াত রহিত করে দিয়েছে। তারপরও আপনি এভাবে লিখছেন কেন? জবাবে উসমান বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র। আমরা তা যথাস্থানে রেখে দিয়েছি। আপন স্থান থেকে কোনো কিছুই আমরা পরিবর্তন করিনি। হুমাইদ রাহি. বলেন, 'অথবা প্রায় এ রকমই উত্তর দিয়ে দিলেন।'
৪২২৩ নম্বর হাদিসে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে পরিবারের লোকেরা কে কত অংশ পাবেন, তা বর্ণনা করা হয়েছে।
সুনানে নাসায়ি : হাদিস নম্বর ৩৫৩২ ও ৩৫৪৪-৪৫ এবং সুনানে আবু দাউদ : হাদীস নম্বর ২২৯২।
-উক্ত হাদিসগুলোতে ইদ্দত এবং ওসিয়ত সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ রহিত হওয়ার আলোচনা করা হয়েছে।
যেমন ৩৫৩২ নম্বর হাদীসটি : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, এই আয়াতটি (অর্থাৎ যে আয়াতে স্ত্রীকে তার স্বামীর ঘরে ইদ্দত পালন করতে বলা হয়েছে, তা) এখন মানসুখ। এখন স্ত্রীর জন্য স্বাধীনতা রয়েছে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ইদ্দত পূর্ণ করার। আল্লাহ তাআলার কালাম তা রহিত করেছে।
০১) সুরা বাকারা : ১০৬ নম্বর আয়াত; সুরা নাহল : ১০১ নম্বর আয়াত এবং সুরা হজ : ৫২-৫৩ নম্বর আয়াত।
-আয়াতগুলোর অর্থ দেখে নিন।

তিন :

'রহিত হওয়া আয়াতের সংখ্যা মোটেও কম নয়। নবি মুহাম্মদের সাহাবি ও সাহাবিদের সংস্পর্শে আসা তাবেয়িগণের মতে, অন্তত পাঁচ শ আয়াত রহিত হয়ে গেছে। এসব আয়াতের বিধান এখন আর কার্যকর নয়, যদিও এর প্রায় সবই এখনো কোরানে রয়ে গেছে। নসখ-মানসুখের দিক দিয়ে তারা সমস্ত সুরাকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন—

ক. ৩০টি সুরায় নসখ-মানসুখ উভয় ধরনের আয়াত রয়েছে। অর্থাৎ, এসব সুরায় বিধান-রহিতকারী আয়াতও রয়েছে, পাশাপাশি পুরাতন বিধানসমৃদ্ধ আয়াতও রয়েছে।

খ. ৩৬টি সুরায় শুধু মানসুখ আয়াতসমূহ রয়েছে। এদেরকে যে আয়াতগুলো রহিত করেছে, সেগুলো অন্য সুরায় স্থান পেয়েছে কিংবা এদের পরিবর্তে অন্য কোনো আয়াত পাঠানো হয়নি।

গ. ০৬টি সুরায় শুধু নসখ আয়াতসমূহ রয়েছে। এই আয়াতগুলো যাদের রহিত করেছে, সেগুলো অন্য সুরায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ. ৪২টি সুরায় নসখ বা মানসুখ-জাতীয় কোনো আয়াত নেই। এগুলো ঝামেলামুক্ত।

সাহাবি ও তাবেয়িগণ পাঁচ শতাধিক রহিত হয়ে যাওয়া আয়াতের কথা বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে আলেমগণ এদের মধ্যে অনেকগুলো আয়াতকে রহিতের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। এ নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে, এখনো প্রচুর মতানৈক্য রয়েছে।

যেমন : ধারণা করা হয়, সুরা বাকারায় অন্তত তেইশটি আয়াত বা আয়াতের অংশবিশেষ অন্য আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে। কিন্তু ইবনুল আরাবি, জালালুদ্দিন সুয়ুতি প্রমুখ আলেমগণ শুধু ছয়টি আয়াতকে রহিত হিসেবে গণ্য করেছেন। সাহাবিদের অগ্রাহ্য করে এখন তাদের মতামতই অনুসরণ করা হয়।

অথচ তারা এমন কিছু আয়াতকে বাদ দিয়েছেন, যা পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এসব আয়াতের বিধান অন্য আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা বাকারার ৬২ নম্বর আয়াতটি পরীক্ষা করে দেখতে পারি। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "নিশ্চয়ই ইয়াহুদি, ক্রিশ্চিয়ান এবং সাবেঈন সম্প্রদায়, এদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ভালো কাজ করে, তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না।"

এই আয়াত পড়ে মনে হতে পারে, ভালো ইহুদি-ক্রিশ্চিয়ান-সাবেঈনগণ বেহেশতে চলে যাবেন। উল্লেখ্য যে, আরবের ইহুদি-ক্রিশ্চিয়ানগণ সৃষ্টিকর্তাকে 'আল্লাহ' বলেই ডাকত এবং পরকালেও বিশ্বাস করত। সুতরাং তারা তাদের ভালো কাজের প্রতিদান পাবে। বড়ই ধর্মনিরপেক্ষ আয়াত! কিন্তু এই আয়াতকে রহিত করেছে সুরা ইমরানের ৮৫ নম্বর আয়াত। যে আয়াতটি ঘোষণা দিয়েছে, "আর যে-কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য জীবনব্যবস্থা অন্বেষণ করে, তা কখনোই তাঁর নিকট হতে পরিগৃহীত হবে না, অতএব পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

এর মানে হলো, নেলসন ম্যান্ডেলা ও মাদার তেরেসার ভালো কাজের কোনো মূল্য নেই। যেহেতু তারা ক্রিশ্চিয়ান, সেহেতু তারা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ওপরের আয়াত দুটি স্পষ্ট দ্বিমুখী, তবু একে মানসুখ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

আল-ইতকান : ২য় খণ্ড, ০৩-০৪ পৃষ্ঠা। Abrogation in the Quran ০৬-০৯ এবং ৭৪-৭৭ পৃষ্ঠা। আল-ফাউযুল কবির ফি উসুলিত তাফসির : ৪৬ পৃষ্ঠা। আল-ইতকান : ২য় খণ্ড ০৬-০৯ পৃষ্ঠা। আল-ফাউযুল কাবির ফি উসুলিত তাফসির : ৪৬ পৃষ্ঠা।'

উত্তর :

নসখ মূলত তিন প্রকার:

১- যার তিলাওয়াত এবং হুকুম উভয়টি মানসুখ হয়ে গেছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায়।

২- যার তিলাওয়াত মানসুখ, কিন্তু হুকুম এখনো বহাল আছে।

৩- যার তিলাওয়াত এখনো কুরআনে বহাল আছে, কিন্তু হুকুম মানসুখ হয়ে গেছে। আর এই প্রকারটির সংখ্যা নিয়ে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে।

কেন এই মতপার্থক্য?

মূলত সাহাবি এবং তাবেয়িগণ 'নসখ'কে একটি ব্যাপক অর্থবোধকরূপে ধরেছেন। কোনো একটি আয়াতের হুকুমের নির্দিষ্টতা ও ব্যাপকতাকে তাঁরা স্ব-অর্থে ধরেননি, বরং নির্দিষ্ট এবং ব্যাপকতার হুকুমসংবলিত আয়াতকেও তাঁরা নসখ ধরেছেন। অর্থাৎ কোনো একটি আয়াতে যদি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং এরপর অন্য আরেকটি আয়াতে সেই ব্যাপক অর্থবোধক আয়াতের একটি নির্দিষ্ট পন্থা বর্ণনা করা হয়, তাহলে সাহাবি এবং তাবেয়িগণ উভয় আয়াতকে স্বীয় অবস্থায় না ধরে প্রথমটিকে (অর্থাৎ ব্যাপক অর্থবোধক আয়াতকে) মানসুখ এবং দ্বিতীয়টিকে (নির্দিষ্ট পন্থা বর্ণনাকারী আয়াতকে) নাসিখ হিসেবে ধরেন। তবে তাঁদের মতে নসখ পূর্ববর্তী আয়াতের হুকুমকে একবারে বাতিল করে দেয় না, বরং পূর্ববর্তী আয়াতে যে ব্যাপকতা বোঝা যেত, পরবর্তী আয়াত তাকে নির্দিষ্ট করে দেয়।

কিন্তু পরবর্তী আলেমগণ নসখকে সে অর্থে ধরেন না। তাঁদের মতে নসখ পূর্ববর্তী আয়াতের হুকুমকে একদম বাতিল করে দেয়। তাই ব্যাপক অর্থবোধক এবং নির্দিষ্ট পন্থা বর্ণনাকারী আয়াত নসখ নয়।

বুঝতেই পারছি, আলোচনা একটু কঠিন হয়ে গেছে। তাই একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি। যেমন ধরুন :

لا تنكحو المشركات حتى يؤمن

'মুশরিকা নারীদের বিবাহ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুমিন না হয়।'

এই আয়াতে 'মুশরিকা বাক্যটি ব্যাপক অর্থবোধক। এবং এই বাক্যের কারণে বোঝা যায় যে, একমাত্র মুমিন নারী ছাড়া সবধরনের মুশরিকা নারীকে বিবাহ করা যাবে

না। চাই সে মুশরিকা নারী অগ্নিপূজক হোক বা আহলে কিতাব হোক। কিন্তু এরপর অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে—

والمحصنت من الذين اوتو الكتاب

'আহলে কিতাবিদের মধ্য থেকে ভালো নারীদের তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।'[৭৪]

এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, আহলে কিতাব নারীকে বিবাহ করা বৈধ এবং পূর্বের আয়াতে যে সকল মুশরিকা নারীদের কথা বলা হয়েছে, তাতে আহলে কিতাব নারীরা অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এই দ্বিতীয় আয়াতটি প্রথম আয়াতটির ব্যাপকতায় নির্দিষ্টতা সৃষ্টি করলো। অর্থাৎ সকল মুশরিকা নারীকে বিবাহ করা বৈধ নয়, তবে আহলে কিতাব নারীরা ছাড়া।

তো সাহাবি এবং তাবেয়িগণ এটাকেও নসখ ধরেন। পূর্বের আয়াতকে মানসুখ এবং পরবর্তী আয়াতকে নাসিখ ধরেন। কিন্তু পরবর্তী আলেমগণ এটাকে নসখ ধরেন না। বরং তাঁদের মতে উভয় আয়াত তার স্বীয় অবস্থানেই রয়েছে। প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলা যে সকল মুশরিকা নারীর সাথে বিবাহকে অবৈধ করেছেন, তার হুকুম এখনো বহাল আছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তাআলা এটা বুঝিয়েছেন, পূর্বের আয়াতে যে সকল মুশরিকা নারীর কথা বলা হয়েছিল, সে সকল নারীর মধ্যে আহলে কিতাব নারী অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথম আয়াতে একটি ব্যাপক হুকুম দেওয়া হয়েছে আর দ্বিতীয় আয়াতে সেই ব্যাপকতার মধ্যে আহলে কিতাব নারীদের বিশিষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং এই পার্থক্যটি ব্যাপকতা এবং নির্দিষ্টতার; নাসিখ-মানসুখের পার্থক্য নয়।

আর এই বিবেচনাবোধের ভিন্নতার কারণে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্য হয়ে যায়।

তাই সাহাবি এবং তাবেয়িগণ কুরআনুল কারীমে ৫০০-এর অধিক আয়াতকে নসখ হিসেবে ধরতেন। কিন্তু পরবর্তী আলেমগণ কুরআনুল কারীমে মাত্র ১৯টি আয়াতকে নসখ ধরেন। আবার পরবর্তী আলেমগণের মধ্যে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহিমাহুল্লাহ'র নিকট কুরআনে মাত্র ৫টি আয়াত নসখ হিসেবে আছে। এবং বাকি ১৪টি আয়াতের ক্ষেত্রে তিনি ব্যাখ্যা পেশ করেন।[৭৫]

---

[৭৪] সূরা বাকারা : ২২১। সূরা মায়িদা : ০৫

[৭৫] *আল-ইতকান*, খণ্ড নম্বর ০৩, পৃষ্ঠা নম্বর ৫৬-৫৭। *উলুমুল কুরআন*, পৃষ্ঠা নম্বর ১৬১ থেকে ১৭২। *আল-ফাউযুল কাবির*, পৃষ্ঠা নম্বর ১১৭।

সুরা বাকারার ৬২ নম্বর আয়াত :

সুরা বাকারার ৬২ নম্বর আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা ইহুদি সম্প্রদায়ের ব্যাপারে ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন।

হজরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর নির্দেশ বারবার অমান্য করা এবং আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হওয়ার কারণে পরকালে তাদের কঠিন শাস্তিভোগ করতে হবে বলা হয়েছে। এরপর ৬২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, 'যারা মুসলমান হয়েছে এবং ইহুদি, খ্রিষ্টান ও সাবেঈন সম্প্রদায়ের সেই সকল লোক, যারা আল্লাহ তাআলা ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং ভালো কাজ করেছিল, তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট পুরষ্কার রয়েছে।'

উক্ত আয়াতে নব্য ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কথা বলা হয়নি, বরং হজরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর যুগ থেকে নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে যে সকল ভালো ইহুদি-খ্রিষ্টান ছিল, তাদের কথাই বলা হয়েছে। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের পর একমাত্র ইসলামধর্ম ব্যতীত অন্য সকল ধর্মকে আল্লাহ তাআলা রহিত করে দেন।

আর সে কথাই তো বলা হচ্ছে সুরা আলে ইমরানের ৮৫ নম্বর আয়াতে—'আর যে-কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য জীবনব্যবস্থা অন্বেষণ করে, তা কখনোই তার নিকট হতে পরিগৃহীত হবে না, অতএব পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[৭৬]

-আরবের ইহুদি-খ্রিষ্টানরা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদকে মানলেও প্রকাশ্যে তারা সে কথা স্বীকার করত না। এমনকি তারা আল্লাহ তাআলার জন্য পুত্র সাব্যস্ত করত। যেমন : ইহুদিরা হজরত উজাইর আলাইহিস সালামকে এবং খ্রিষ্টানরা হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলে দাবি করত। সুরা তাওবার ৩০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের দাবির কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এসব ওদের মুখের কথা। ওরা পূর্ববর্তী কাফিরদের অনুকরণ করছে।' অর্থাৎ তারা যে ঈমান ও তাওহিদের কথা বলে, তা অর্থহীন। বরং তাদের আকিদা-বিশ্বাস মুশরিকদের মতোই।

-হ্যাঁ, অবশ্যই নেলসন ম্যান্ডেলা এবং মাদার তেরেসার ভালো কাজের পারলৌকিক কোনোই মূল্য নেই। কারণ, তারা ইসলাম ধর্মের ওপর মৃত্যুবরণ করেনি।

---

[৭৬] তাফসিরে মাআরেফুল কুরআন, তাফসির দ্রষ্টব্য।

সূত্র পর্যালোচনা:
০১) *আল-ইতকান*, ২য় খণ্ড ০৩-০৪ পৃষ্ঠা।
০২) Abrogation in the Quran ০৬-০৯ এবং ৭৪-৭৭ পৃষ্ঠা।
০৩) *আল-ফাউযুল কবির ফি উসুলিত তাফসির* : ৪৬ পৃষ্ঠা।
০৪) *আল-ইতকান* ২য় খণ্ড, ০৬-০৯ পৃষ্ঠা।
০৫) *আল-ফাউযুল কবির ফি উসুলিত তাফসির* : ৪৬ পৃষ্ঠা।
-উক্ত পৃষ্ঠাগুলোতে নসখের আলোচনা বর্ণিত।

চার :

'এ রকম অসংখ্য আয়াতকে রহিত হিসেবে মনে না করলেও ইবনে আরাবি, সুয়ুতি প্রমুখ আলেমগণ বেশকিছু আয়াতকে রহিত বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এসবের মধ্যে পাঁচটি সুরার পাঁচটি আয়াতকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ দিচ্ছি।

সুরা বাকারার ১৮০ নম্বর আয়াতে পিতামাতা ও আত্নীয়দের জন্য অসিয়ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। শুরুতে নিয়ম ছিল, অসিয়ত হবে পিতামাতা-আত্নীয়-স্বজনের জন্য এবং উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাওয়া সম্পদ হবে সন্তানাদির জন্য। অসিয়ত না করলে পিতামাতার জন্য কিছু থাকবে না। পরবর্তীতে সবার জন্য নির্দিষ্ট হারে সম্পদ ভাগাভাগি করে নিতে সুরা নিসার ১১ নম্বর আয়াত দ্বারা একে রহিত করা হয়।'

উত্তর :

পূর্বেও এই কথাটি বলেছি যে, এসব নাস্তিক মূলত নারী অধিকারে বিশ্বাস করে না। হিরো সাজার জন্যই শুধু গলা ফাটিয়ে নারী অধিকারের আওয়াজ তোলে। আর যখনই কুরআনে নারী অধিকারের আলোচনা আসে, তখন তারা চেতে উঠে আয়াতগুলোকে বিকৃত করার চেষ্টা করে।

জাহেলি যুগে পুরুষের সম্পত্তিতে নারী এবং শিশুরা কোন অংশ পেত না। আর এ জন্যই সুরা বাকারার ১৮০ নম্বর আয়াতে নারী ও শিশুদের পক্ষ নিয়ে সর্বপ্রথম ইসলামই কথা বলে। পুরুষের সম্পত্তিতে তাদের অংশ দিতে অসিয়তের নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে যায়। এবং মৃতব্যক্তির সম্পত্তিতে সবার জন্য একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণকৃত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ঘটনা :

হজরত আউস ইবনে সাবিত রা. স্ত্রী, দুই মেয়ে ও একটি নাবালেগ পুত্রসন্তান রেখে মারা যান। জাহেলি যুগের প্রথা অনুযায়ী তাঁর দুই চাচাতো ভাই এসে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি দখল করে নিয়ে নেয়। সে আউস রা.-এর স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পত্তিতে কোনো ভাগ দেয়নি। তখন হজরত আউস রা.-এর স্ত্রী এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উক্ত ঘটনাটিসহ তাঁদের অসহায়ত্বের কথা বর্ণনা করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা সুরা নিসার ১১ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ করে পুরুষের সম্পত্তিতে নারী এবং সন্তানদের অংশ নির্ধারণ করে দেন; যাতে নারী এবং শিশুদের সাথে এ রকম কাণ্ড আর কেউ যেন না করতে পারে।[৭৭]

পাঁচ :

> 'সুরা ইমরানের ১০২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমরা আল্লাহকে যতটুকু ভয় করা উচিত, ততটুকুই ভয় করো।" পরবর্তীতে একে রহিত করে দিয়ে সুরা তাগাবুনের ১৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহকে সাধ্যমতো ভয় করার কথা।'

উত্তর :

শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহিমাহুল্লাহ'র নিকট উক্ত আয়াতদ্বয়ে নসখ নেই।

বরং তিনি বলেন, "তোমরা আল্লাহকে যতটুকু ভয় করা উচিত, ততটুকুই ভয় করো।"-এই আয়াতটি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ তোমরা ভ্রান্ত বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে আল্লাহকে যতটুকু ভয় করা উচিত, ততটুকুই ভয় কর।

এবং এর পরের আয়াত- 'তোমরা আল্লাহকে সাধ্যমতো ভয় করো।' কর্মের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ কর্মের ক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করো। যেমন : অসুস্থ অবস্থায় অজু করতে না পারলে তায়াম্মুম করে নেওয়া। এ ক্ষেত্রে সাধ্যমত ভয় তায়াম্মুম করলেই পূরণ হবে।[৭৮]

---

[৭৭] তাফসিরে মাআরেফুল কুরআন ও তাফসিরে ইবনে কাসির, তাফসির দ্রষ্টব্য।

[৭৮] *আল-ফাউযুল কাবির*, পৃষ্ঠা নম্বর ১২৭।

ছয় :

'সুরা আনফালের ৬৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, "বিশ জন ধৈর্যশীল জিহাদি থাকলে তারা দুই শ জনের সাথে জয়ী হবে।" এই আয়াতের বিধান হলো, প্রতি দশজনের বিপরীতে একজন জিহাদিও যদি থাকে, সে যেন পালিয়ে না আসে। এই বিধান রহিত করে পরবর্তী আয়াতে নতুন বিধান দেয়া হলো, দুই শ জনের বিপরীতে এক শ জন জয়ী হবে। অর্থাৎ, দুই শ জনের বিপরীতে এক শ জন থাকলে তারা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকে। তবে সংখ্যাটি এক শ জনের কম হলে পালিয়ে আসা যাবে।'

উত্তর :

সুরা আনফালের ৬৫ নম্বর আয়াতটি সংবাদদানের মতো মনে হলেও উক্ত আয়াতে একটি হুকুম রয়েছে। আর তা হলো, মুসলমানদের পক্ষে তাদের চেয়ে দশ গুণ বেশি শত্রুর মুকাবিলা থেকে পালিয়ে যাওয়া বৈধ নয়। এরপর পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের ওপর অনুগ্রহপূর্বক উক্ত আয়াতটি রহিত করে তারপরের আয়াতে নির্দেশ দিলেন যে, এখন আর দশ গুণ নয়; দুই গুণ বেশি শত্রুর মোকাবেলা থেকে তোমাদের জন্য পালিয়ে যাওয়া বৈধ নয়।[৭৯]

সাত :

'সুরা আহযাবের ৫২ নম্বর আয়াতে নবি মুহাম্মদকে আরও অতিরিক্ত বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু একই সুরার ৫০ নম্বর আয়াত দ্বারা বিবাহ নিষিদ্ধ করার এই আদেশ রহিত করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি চাইলে ইচ্ছেমতো আরও বিবাহ করতে পারেন।'

উত্তর :

আল্লামা ইবনে জারির রাহিমাহুল্লাহ'র মতে উক্ত আয়াতদ্বয়ে নসখ নেই। ৫০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা কিছু নির্দিষ্ট নারীর কথা বলেছেন, যাদের বিবাহ করা জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং ৫২ নম্বর আয়াতে সেই নারীদের ব্যতীত অন্যান্য নারীদের বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

---

[৭৯] *আসবাবুন নুজুল*, পৃষ্ঠা নম্বর ৮৯। *উলুমুল কুরআন*, পৃষ্ঠা নম্বর ১৬৯।

আর সেই নির্দিষ্ট নারীরা হলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ।[৮০]

আট :

'সুরা মুজাদালার ১২ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, নবি মুহাম্মদের সাথে চুপে চুপে কথা বলতে হলে সামর্থ্যবানদের আগে সাদাকা প্রদান করতে হবে। এই বিধান রহিত করে দেওয়া হয় পরবর্তী আয়াতে।'

উত্তর :

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনরাত জনসংস্কারমূলক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। দূর-দূরান্ত থেকে সাহাবায়ে কেরামগণ তাঁর দরবারে আসতেন এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান জানতে চাইতেন। এই অবস্থা দেখে মুনাফিকরা ঠিক করল যে, তারা একজন একজন করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে একান্তে কথা বলার বাহানায় তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করবে। এবং এতে লাভ হবে দুটি :

১- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য সাহাবিদের সময় দিতে পারবেন না।

২- মুনাফিকদের দেখাদেখি গ্রাম্য সাহাবিগণও না বুঝে তাদের রাস্তা অনুসরণ করবেন। আর এতে করে রাসুলের সময় আরও বেশি নষ্ট হবে এবং তিনি সেই সাহাবিদের ওপর বিরক্ত হবেন।

তখন আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের প্ল্যান বানচাল করার জন্যই সুরা মুজাদালার ১২ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ করেন। এরপর থেকে আর মুনাফিকরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আর একান্তে কথা বলতে চাইত না।

আর গ্রাম্য সাহাবিগণও মুনাফিকদের প্ল্যান বুঝে ফেলায় তারাও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে একান্তে কথা বলা বন্ধ করে দেন। এরপর তার পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়।[৮১]

---

[৮০] *তাফসিরে তাবারি*, তাফসির দ্রষ্টব্য। *উলুমুল কুরআন*, পৃষ্ঠা নম্বর ১৬৯-১৭০।
[৮১] *আসবাবুন নুজুল*, পৃষ্ঠা নম্বর ১৬৯-১৭০। *তাফসিরে তাবারি*, তাফসির দ্রষ্টব্য।

নয় :

'নসখ-মানসুখ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, কোরান মানবসৃষ্ট একটি গ্রন্থ। এখানে মাঝেমধ্যে ভুল বিধান অনুসরণ করতে বলা হয়। যখন দেখা যায়, এই বিধান কাজ করছে না, বরং সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, তখন সেই ভুল শুধরে নিয়ে নতুন বিধান প্রতিস্থাপন করা হয়। হাস্যকর ব্যাপার। নসখ-মানসুখের ব্যাপারটি এখানেই শেষ নয়। মূলত তিন ধরনের নসখ-মানসুখ দেখা যায়।

ক. আয়াত কোরানে আছে, কিন্তু বিধান রহিত করে দেওয়া হয়েছে। ওপরে আমরা যা আলোচনা করেছি, সেটা এই বিভাগের মধ্যে পড়ে।

খ. আয়াত কোরান থেকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিধান বহাল রাখা হয়েছে। রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যা করাসংক্রান্ত বিধানটি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। খলিফা উমর বলেছেন, রজমের আয়াত কোরানে ছিল, তারা এই আয়াতের বিধান নবি মুহাম্মদের আমলে অনুশীলনও করেছেন। কিন্তু বর্তমান কোরানে এটি রাখা হয়নি। উমর এটাও বলেছেন যে, সমালোচনার ভয় না থাকলে তিনি এটি কোরানের অন্তর্ভূক্ত করতেন।

গ. আয়াত ও বিধান, উভয়ই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। মানে হলো, রহিত হওয়া আয়াত কোরানে রাখা হয়নি। সেই আয়াতের বিধানও এখন আর অনুশীলন করা হয় না। নবি মুহাম্মদের খাদেম আনাস বিন মালিক সুরা তাওবার ক্ষেত্রে এ ধরনের একটি আয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন। সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদও এমন একটি আয়াতের বর্ণনা দিয়েছেন। নবিপত্নী আয়িশা বর্ণিত দুধপান সংক্রান্ত আয়াতটিও এই বিভাগের মধ্যে পড়ে।

খ' ও 'গ' নম্বর নিয়ে অনেক মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এগুলো রহিত হয়নি, বরং হারিয়ে গেছে বা কোরান সংকলনের সময় বিভিন্ন কারণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।'

০১) সহিহ মুসলিম : ৪২৭১ নম্বর হাদিস; সুনানে আবু দাউদ : ৪৩৬৫ নম্বর হাদিস; সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৫৫৩ নম্বর হাদিস; আল-ইতকান : ২য় খণ্ড, ১৬ পৃষ্ঠা এবং Abrogation in the Qoran ০৫পৃষ্ঠা।

০২) আল-ইতকান : ২য় খণ্ড, ০৪ পৃষ্ঠা এবং Abrogation in the Qoran ০৫ পৃষ্ঠা।

উত্তর :

এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই সবিস্তারে আলোচনা করে এসেছি। তাই এখানে পুনরায় উল্লেখ করে কলেবর বৃদ্ধি করছি না।

দশ :

'সবশেষে আরেকটি কথা। অসংখ্য হাদিস রয়েছে, যেখানে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। সুরা নিসার ৯৫ নম্বর আয়াত নবি মুহাম্মদের ওপর অবতীর্ণ করা হলো। এখানে বলা হলো, "মুমিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে এবং যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, তারা সমান নয়।"

সাহাবিগণ আয়াতটি লিখে রাখলেন। এ সময় অন্ধ সাহাবি উম্মে মাকতুম বললেন, "হে রাসুলুল্লাহ! আমি দৃষ্টিহীন। সামর্থ্য থাকলে তো আমিও জিহাদে যেতাম।" তখন নবি মুহাম্মদ এই আয়াতের মধ্যে 'গাইরু উলিদ দারার বা অপারগ ব্যক্তিগণ ব্যতিরেকে শব্দগুলো অন্তর্ভুক্ত করলেন। এটা কী প্রমাণ করে?' *সহিহ বুখারি : ৪২৩৮-৩৯ নম্বর হাদিস এবং সুনানে নাসায়ি : ৩১০২ নম্বর হাদিস।'*

উত্তর :

এখানে সে এ কথা বোঝাতে চাচ্ছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এত তাড়াতাড়ি আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা.-এর প্রশ্নের উত্তরে 'গাইরু উলিদ দারার' বললেন, তাহলে প্রমাণ হয় যে, কুরআনে যা কিছু আছে তার সবই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন!

অসংখ্য সাহাবি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর অহি অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা বর্ণনা করেছেন। সেসব হাদিসের প্রতি লক্ষ করলে সহজেই বোঝা যায়, কুরআন মানবরচিত কোনো গ্রন্থ নয়। সেসব হাদিস এখানে উল্লেখ না করে শুধু উক্ত বাক্যটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা কেমন ছিল, তা একজন সাহাবির ভাষ্য থেকে দেখে নিই।

ইসমাঈল ইবনে আবদুল্লাহ রা. যাইদ ইবনে সাবিত রা. থেকে বর্ণনা করেন, 'তিনি বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আয়াতটি লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলে যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় উম্মে মাকতুম রা. তাঁর কাছে আগমন করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর শপথ যদি আমি জিহাদে সক্ষম হতাম তাহলে অবশ্যই জিহাদ করতাম। তিনি (উম্মে মাকতুম)

অন্ধ ছিলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর (রাসুলের) ওপর অহি অবতীর্ণ করলেন, এমতাবস্থায় যে, তাঁর উরু আমার উরুর ওপর ছিল, আর তা আমার কাছে এতই ভারী অনুভুত হচ্ছিল যে, আমি আমার উরু থেতলে যাওয়ার আশঙ্কা করছিলাম।

তারপর তাঁর থেকে এই অবস্থা কেটে গেল, আর আল্লাহ তাআলা নাজিল করলেন : 'গাইরু উলিদ দারার।'

মূলত যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর অহি অবতীর্ণ হতো, তখন সাহাবিগণও তা প্রত্যক্ষ ও অনুভব করতেন।

উক্ত হাদিসের ভাষ্যতেই দেখা যাচ্ছে যে 'গাইরু উলিদ দারার' বাক্যটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসুল সাল্লাহু আলাইহিসালাম-এর শরীর ভারী হয়ে গিয়েছিল। এবং হজরত যাইদ ইবনে সাবিত রা. তা অনুভব করেছিলেন।

'এটা কী প্রমাণ করে?'

এটা প্রমাণ করে যে কুরআনুল কারিমের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কুরআনুল কারিম একমাত্র আল্লাহ তাআলারই কালাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে একটি বিন্দুও অন্তর্ভুক্ত করেননি।[৮২]

সর্বশেষ

ইসলামের শুরু থেকে বিকৃতমস্তিষ্কের মানুষজন কুরআনুল কারিমকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে। এবং বর্তমানে সেই বিকৃতমস্তিষ্ক মানুষজনের প্রেতাত্মারা একই কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু ইতিপূর্বেও আল্লাহ তাআলা কুরআনকে যেভাবে রক্ষা করেছেন, ভবিষ্যতেও সেভাবে রক্ষা করবেন। যারা কুরআনকে বিকৃত করার চেষ্টা করবে, তারাই বিকৃত হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

সূত্র পর্যালোচনা:
০১) সহিহ বুখারি : ৪২৩৮-৩৯ নম্বর হাদিস এবং সুনানে নাসায়ি : ৩১০২ নম্বর হাদিস।
-মূল পয়েন্টে এ সম্পর্কীয় হাদিস বর্ণনা করেছি।

---

[৮২] *বুখারি শরিফ*, হাদিস নম্বর ৪২৩৭, ০২, ০৩, ০৪।

গ্রন্থসূত্র

* তাফসিরে ইবনে কাসির। কাদিমি কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান।
* তাফসিরে তাবারি। মাকতাবায়ে তাওফিকিয়্যা, মিসর।
* তাফসিরে কুরতুবি। জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন, লাহুর, পাকিস্তান।
* তাফসিরে বাইজাবি। যাকারিয়া, দেওবন্দ।
* হাশিয়াতুশ শিহাব আলা তাফসিরিল বাইজাবি। দারুল কুতুব, বৈরুত, লেবানন।
* তাফসিরে জালালাইন। রশিদিয়া, দেওবন্দ।
* তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন, ইদারাতুল মাআরিফ, কুমিল্লা, বাংলাদেশ।
* তাফসিরে মাজহারি। রশিদিয়া, দেওবন্দ।
* বয়ানুল কুরআন। ফরিদ বুক ডিপো, নিউ দিল্লি।
* তাফসিরে উসমানি। মদিনাতুল খাইরি আল ইসলামি, ঢাকা।
* আসবাবুন নুযুল। আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ঢাকা
* আল ইজাহ ফিল কিরাআহ। আহমদ ইবনে আবি উমর আনদারাবি।
* আন নাশরু ফিল কিরাআতিল আশার। শামসুদ্দিন আবুল খায়ের ইবনে জাযিরি।
* আত তিবয়ান। ড. মুহাম্মদ আলি আস সাবুনী।
* আহকামুল কুরআন। মাকতাবায়ে তাওফিকিয়্যা, মিসর।
* ফুনুনুল আফনান ফি উয়ূনি উলূমিল কুরআন। দারুল বাশায়ের, বৈরুত, লেবানন।
* আল-ইতকান। দারুল হাদিস, কায়রু, মিশর।
* আল ফাউজুল কাবির ফি উসূলিত তাফসির। ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।
* আল খাইরুল কাসির ফি উসূলিত তাফসির। মাদানী দারুল মুতালাআ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
* এরাবুল কুরআন। দারুল হাদিস।
* উলূমুল কুরআন। মাকতাবায়ে থানবি, দেওবন্দ।
* ফাতহুল বারি। দারুল কুতুব, বৈরুত, লেবানন।
* উমদাতুল কারি। মাকতাবায়ে তাওফিকিয়্যা, মিসর।
* ফাতহুল মুলহিম (মুকাম্মাল)। যাকারিয়া দেওবন্দ।
* আল মিনহাজ। দারুল কুতুব।
* মাআরিফুস সুনান। যাকারিয়া, দেওবন্দ।
* তুহফাতুল আহওয়াজি। দারুল হাদিস, কায়রো।
* শরহে সুনানে ইবনে মাজা। এইচ এম সাঈদ, পাকিস্তান।
* বজলুল মজহুদ। দারুল বাশায়ের।
* মিরকাতুল মাফাতিহ। যাকারিয়া দেওবন্দ।
* তাজরিবুর রাওয়ী। মাকতাবায়ে তাওফিকিয়্যা, মিসর।
* আসসিকাত। দারুল ফিকির।
* মুকাদ্দিমাতু ইবনুস সালাহ। আশরাফিয়া, দেওবন্দ।
* মাআরিফুস সিকাত। দারুল ফিকির।
* সিরাতে মুস্তফা। রাব্বানি বুক ডিপো, লালকুট, দিল্লী।
* মাআরিফাতুস সাহাবা। দারুল ওয়াতান।
* আল বিদায় ওয়ান নিহায়া। দারুল আকিদাহ; ইস্কান্দরিয়া, কায়রো, মিশর।
* তারিখে তাবারি। দারুল হাদিস।
* তারিখুল ইসলাম। ফয়সাল পাবলিকেশন, দেওবন্দ।
* হায়াতুল সাহাবা।
* আল মুহিতুল বুরহানি। তাওফিকিয়্যা, মিসর।
* ফাযায়েল জিহাদ। ছগির বিন ইমদাদ।
* সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ। ইসলামি ফাউন্ডেশন।
* কুরআন হাদিস সংকলনের ইতিহাস।
* তাফহিমুল কুরআন।
* Abrogation in the Quran

লেখক পরিচিতি

হাসান আনহার

পূর্ণ নাম : খাইরুল হাসান আনহার খান।

জন্ম: ১৯৯৩ সালের জুন মাসে সিলেটের গোলাপগঞ্জ থানার রুস্তমপুর গ্রামে।

বাবা: সিলেট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ও কেন্দ্রীয় শাহী ঈদগাহের খতিব মাওলানা মুশতাক আহমদ খান।

শিক্ষা : শিক্ষার শুরু 'সবুজ কুড়ি শিশু বিদ্যালয়' নামে একটি স্কুলে। অতঃপর বাবার পরিচালিত মাদরাসায় হিফজ থেকে নিয়ে মুখতাসার জামাত পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। এরপর চলে যান চট্টগ্রামস্থ হাটহাজারি মাদরাসায় শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী দা.বা.-এর সাহচর্যে।

ওখানে ফজিলত ও তাকমিল ফিল হাদিস সমাপ্ত করে আরও দুবছর লেখাপড়া করেন ইফতা বিভাগে (ইসলামিক আইন গবেষণায়)।

জড়িত আছেন সেবামূলক কয়েকটি সংগঠনের সাথে। 'আস সীরাহ ফাউন্ডেশন' নামে একটি সেবামূলক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। অসহায় মানুষদের নিয়েই সময় কাটাতে ভালোবাসেন।

লেখকের ফেসবুক আইডি :
Facebook.com/hasan.anhar

Cover : Rashid Mushtak

Kalantor Prokashoni

$ 7.00
50995 >
9 780692 820646

BIPROTHIP
by **Hasan Anhar**
Kalantor Prokashoni
Cover : Rashid Mushtak
Price: BD ৳ 140, US $ 7, UK £ 5
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.kalantorprokashoni.com
ফেসবুক
facebook.com/kalantorprokashoni
অনলাইন পরিবেশক
রেনেসাঁ
facebook.com/renesabookshop
Wafi Life
wafilife.com/kalantorprokashoni

বইটি কেন পড়বেন...

আল কুরআন। আল্লাহ তাআলার কালাম। মহাপবিত্র ঐশী গ্রন্থ। সন্দেহ-সংশয়ের সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে যার অবস্থান। এর উৎপত্তিস্থল খোদ মহান স্রষ্টা। যার ওপর নির্ভর করে ইসলামের ভিত্তি।

এ নির্ভুল গ্রন্থটি নিয়েও খোদাদ্রোহী সেকুলারদের অসাড় আপত্তির অন্ত নেই। আসলে আপত্তি তো নয়। সরলমনা মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার একধরনের অপপ্রয়াস মাত্র। বিভিন্ন ধরনের দলিলকে বিকৃত করে তারা তাদের মিশন চালিয়ে যাচ্ছে এবং এভাবে ক্রমশ এজেন্ডা বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে।

আলিমকুল শিরোমণি আল্লামা শাহ আহমদ শফি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় রচিত হয়েছে নাস্তিকদের কুরআন সংক্রান্ত আপত্তিগুলোর অসাধারণ দালিলিক পর্যালোচনামূলক গ্রন্থ 'বিপ্রতীপ'।

গ্রন্থটি রচনা করেছেন শাইখের একান্ত সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তরুণ আলিম হাসান আনহার।